KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007 | Place of Publication ৫৪ সুকিয়া স্ট্রীট, কলি-৬ |
| Collection : KLMLGK | Publisher বীর ঠাকুর |
| Title ছড়াঘর | Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m. |
| Vol. & Number ৫২/১<br>৫২/২<br>৫২/৩<br>৫২/৪ | Year of Publication বৈশাখ ১৩৯৮ ।। May 1991<br>জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮ ।। Jun 1991<br>আষাঢ় ১৩৯৮ ।। July 1991<br>শ্রাবণ ১৩৯৮ ।। Aug 1991 |
| | Condition : Brittle - Good |
| Editor : অরুণ ঠাকুর | Remarks : |

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

# চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫২ সংখ্যা ১ মে, ১৯৯১

রবীন্দ্রনাথকে লেখা সুভাষচন্দ্রের তিনখানি চমকপ্রদ তথ্যবাহী অপ্রকাশিত পত্র। পত্রালাপের পটভূমি এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী সংযোজন করেছেন ড· শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

শতাব্দীর শেষ দশকে পৌঁছে আমরা কি মানুষের আগ্রাসী ও আত্মঘাতী বৃত্তিকে সংযত করবার দিকে একটুও এগিয়েছি? এই অনুসন্ধিৎসায় রচিত শিবনারায়ণ রায়ের বিশ্লেষণী নিবন্ধ "সুস্থ সমাজের সন্ধানে।"

"একদিন আমি দেখেছিলেম" শীর্ষক আলোচনায় ড· পিনাকী ভাদুড়ীর প্রতিপাদ্য বিষয়, "রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ইতিহাস তাঁর বিস্ময়দৃষ্টির কাহিনী"।

"যামিনী রায় ও আমরা"—আলেখ্যর শেষাংশ।

নির্বাচনে প্রতিফলিত জনমত প্রকৃত অর্থে কতখানি গণতন্ত্রসচেতন জনগণের মত? এই নিয়ে বিশ্লেষণী নিবন্ধ।

ভোটযুদ্ধে বাংলাদেশী দেয়াললিখনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন।

সমাজতন্ত্রের মহিমা কি আজ ম্লান? এই জিজ্ঞাসাকে ঘিরে দুখানি মূল্যবান গ্রন্থের পর্যালোচনা।

"উপসাগরীয় সঙ্কটের পটভূমি" প্রসঙ্গে জনৈক পাঠকের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অধ্যাপক এ· ডবলিউ· মাহ্‌মুদ।

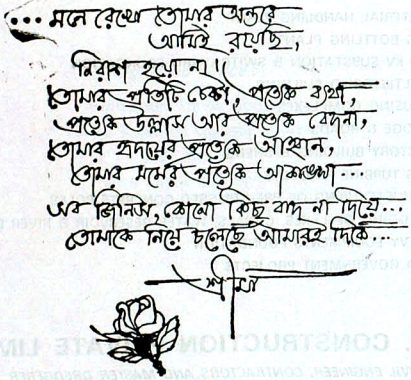


বর্ষ ৫২। সংখ্যা ১
মে ১৯৯১
বৈশাখ ১৩৯৮



শিল্পপরিকল্পনা। বনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২১-৬৩২১

## চতুরঙ্গ

প্রতি সংখ্যা ছয় টাকা
সডাক গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৭০ টাকা
ষান্মাসিক ৩৫ টাকা

### এজেন্সির নিয়মাবলী

১। পাঁচ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।
২। কমিশন শতকরা ২৫। পঁচিশ কপির ঊর্ধ্বে শতকরা ৩০।
৩। ডাক-খরচ আমরা বহন করি।
৪। কপি-পিছু তিন টাকা আমাদের দপ্তরে জমা রাখতে হবে।

•

### লেখকদের প্রতি নিবেদন

যাঁরা প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাবেন তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে নকল রেখে পাঠান—অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

অন্যান্য অমনোনীত রচনা যাঁরা ফেরত নিতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে উপযুক্ত পরিমাণে ডাক-টিকিট পাঠালে আমাদের সহায়তা করা হবে।

প্রেরিত রচনায় অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত বিদেশী ব্যক্তিনাম আর স্থাননাম থাকলে, সঙ্গে আলাদা একটি কাগজে ইংরেজি বড়ো হরফে সেগুলি লিখে দিলে উপকার হবে।

# সুস্থ সমাজের সন্ধানে

**শিবনারায়ণ রায়**

এক সময়ে সাধারণভাবে উনিশ-শতকী চিন্তার এবং বিশেষভাবে হেগেল আর মার্ক্সের দর্শনের প্রভাবে আমাদের মনে এই প্রতীতি দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল যে বিবর্তনের একটি পূর্বনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসারেই ইতিহাস পর্বে-পর্বে প্রকটিত হয়, এবং এই প্রকটনেরই অপর নাম প্রগতি। আমার মতে যাঁরা নিরীশ্বরবাদী তাঁরা ইতিহাসকে সম্ভবত ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে প্রগতির অবশ্যম্ভাবিতায় নৈতিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি খুঁজেছিলেন। রুশ বিপ্লবের পরে নিরন্তর আর ব্যাপক প্রচারের ফলে ইতিহাসচর্চায় মার্কস-আরোপিত অধ্যাসটি শিক্ষিত মনে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। আমার প্রজন্মের খুব কমসংখ্যক ভাবুকই সেই প্রভাব পুরোপুরি এড়াতে পেরেছেন।

পঠনপাঠন এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমে বুঝতে শিখি যে মানুষের সমাজে এবং ইতিহাসে বৈচিত্র্য অফুরান; যে ইংল্যানডে অথবা পশ্চিম ইয়োরোপে মার্কস যে বিশেষ পর্বক্রমের পরিকল্পনা করেছিলেন সেটি এশিয়া অথবা আফ্রিকার সমাজ- অথবা ইতিহাস -ব্যাখ্যায় সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে; যে ইতিহাসে যদিবা প্রবণতা বলে কিছু থাকে, অনিবার্যতা বলে কিছু নেই। প্রকৃতিপরিবেশ, সঞ্চিত অভিজ্ঞতার নৈতিক-সাংস্কৃতিক রূপায়ণ এবং আকর্ষী সামর্থ্য, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে মননশক্তির তারতম্য, প্রযুক্তির উদ্ভাবন আর ব্যবহার, এবং আরো নানা রকমের কার্যকারণের সমাবেশে এক-এক সমাজ এক-এক আকার ধারণ করে এবং এক-এক ধারায় চালিত হয়। এই বৈচিত্র্য মানবকথার বৈশিষ্ট্য, এবং এটি বিড়ম্বনার নয়, সম্পন্নতারই উৎস। আজটেক আর্ট, গ্রীক আর্ট, নিগ্রো আর্ট, আরব আর্ট, চীনা আর্ট, তাদের সাহিত্য, সংগীত, আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিক-সাংস্কৃতিক ধারণা- বিশ্বাসাদি আপন-আপন চারিত্রে এবং ঐতিহ্যে অপর থেকে ভিন্ন। কিন্তু তাদের উদ্ভব এবং বিকাশ সমগ্রভাবে মানবকথাকে তার বহুবাচনিক সম্পন্নতা দিয়েছে।

তবে বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব স্বীকার অথবা তাকে বিশেষ মূল্য দেবার তাৎপর্য এটা মোটেই নয় যে প্রজাতি হিসেবে মানুষের কিছু সামান্য অথবা সার্ব লক্ষণ নেই। ভ্রূণাবস্থা থেকেই এইসব সার্ব লক্ষণ মানুষকে চিহ্নিত করে এবং জন্মের পরে তার প্রাকৃতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পারিবারিক পরিবেশ এইসব লক্ষণের প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠায় কখনো সহায়ক, কখনো নিরোধক, কখনো দুইই হয়ে ওঠে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার এবং আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রে এই লক্ষণাদির অনেকটাই আমাদের জ্ঞানগোচর। যাঁরা মানবজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষভাবে চর্চা করেন—জীববিজ্ঞানী, প্রাণিবিজ্ঞানী, শরীরশাস্ত্রী,

প্রজনবিদ্, মনোবিদ্, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি,—তাঁদের গবেষণা এবং রচনা থেকে এই সার্বলক্ষণগুলি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্টতর এবং নির্ভরযোগ্য হয়। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মতোই আহার, মৈথুন, নিদ্রা, বংশবৃদ্ধি, সমাজবদ্ধতা, আশ্রয় ও নিরাপত্তার সন্ধান সব দেশে-কালেই মানুষদের মধ্যে দেখা যায়। অপর পক্ষে, প্রাজাতিক ভাবে বিশিষ্ট গুরুমস্তিষ্কের অমিত সম্ভাবনাসামর্থ্য নিয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ফলে মানুষ জিজ্ঞাসু, কল্পনাশীল, উদ্ভাবক, নির্মাণক্ষম, স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী। এই সম্ভাবনা-রাজির বাস্তবায়ন নানা শর্তসাপেক্ষ। কিন্তু শিশু-মাত্রই প্রশ্ন করে, আদিম মানুষ গুহার প্রাচীরে ছবি এঁকেছে, আরো পরে উদ্ভাবন করেছে লাঙল আর চাকা, গড়েছে মাথার উপরে ছাউনি, জলে ভাসবার নৌকো, ক্রমে সচেতন হয়েছে গোষ্ঠীবদ্ধতার অতিরিক্ত নিজস্ব একান্ত অস্তিত্ব সম্পর্কে। মানুষের সর্বোত্তম উদ্ভাবন তার ভাষা। দেশে কালে ভাষার বৈচিত্র্য বিস্ময়কর; কিন্তু যা মানুষের ক্ষেত্রে সার্বলৌকিক তা হল তার এই প্রাজাতিক বৈশিষ্ট্য—তার অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, ভাবনাচিন্তা, অনুভব-আকাঙ্ক্ষার নির্মীয়মাণ সঞ্চয়কে নির্দিষ্ট ফোটবিন্যাসে প্রকটিত করবার এবং স্থায়িতা দেবার সামর্থ্য। এই মহাবৈপ্লবিক উদ্ভাবন শিক্ষাসূত্রে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানবশিশুর আয়ত্তে আসে—মানুষের ক্ষেত্রে এই সামর্থ্য সার্বদেশিক—শেখালে সব শিশুই কোনো-না-কোনো মানবিক ভাষা শিখতে পারে যে ভাষা মনুষ্যেতর প্রাণীদের ভাষার তুলনায় অনেক-অনেক বেশি অভিজ্ঞানগর্ভ, প্রতীকী, বিমূর্ত, পরোক্ষ, সংজ্ঞাধিত, সম্ভাবনাসমৃদ্ধ। অক্ষর-উদ্ভাবনের ফলে মানুষের ইতিহাসে বৃহত্তম বিপ্লব সংঘটিত হয়—অক্ষরসম্পন্ন ভাষার মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ক সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদিকে দ্রুত বিকাশশীল করে তোলে—সমাজের উত্তরণ ঘটে সভ্যতায়। মানুষ শুধু নানাবিধ অক্ষরতন্ত্রের উদ্ভাবক নয়; শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে সব মানুষই এই উদ্ভাবন স্বীয় আয়ত্তে আনতে পারে; মনুষ্যেতর প্রাণীরা তা পারে না। যেমন ক্ষুধাতৃষ্ণা রমণরেচন মনুষ্য-প্রজাতির সামান্য লক্ষণ তেমনি মনন, উদ্ভাবন, সৃজন, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপও মানবীয় সার্ব চারিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাজাতিক সামান্য লক্ষণ আছে ঠিকই, তবে তারই সঙ্গে ভিতরে এবং বাইরে নানা দ্বন্দ্ব-বিরোধও আছে। মানুষ যেমন অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়—যার প্রকাশ ভালোবাসায়, বন্ধুতায়, পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্ক রচনায়, ভাষার বিকাশে—তেমনই চায় অপরকে নিজের অধীন করতে—যার প্রকাশ নানা রকমের জুলুমতন্ত্রে এবং তার ফলস্বরূপ নানা রকমের সংঘাতে। স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা, করুণা সব মানুষের মধ্যেই কমবেশি বিদ্যমান—হিটলারের মতো প্রায়োন্মাদ এবং ক্রূরপ্রকৃতির মানুষও তার কুকুরকে এবং সম্ভবত তার স্বজাতিকে গভীরভাবে ভালোবাসত। অপর পক্ষে, কোনো মানুষই ক্ষমতাসক্তি, ঈর্ষা, লোভ, ক্রোধ, অহংকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে বলে জানা যায় না—স্বয়ং গান্ধী কংগ্রেসের "ডিক্টেটর" পদ গ্রহণ করেছিলেন, এবং সুভাষচন্দ্রের বিতাড়নে কুণ্ঠিত হন নি। মানুষের ভিতরে জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেমন প্রবল, তেমনি শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য বা নেতৃবাক্য বিচারাধর্ব—এই বিশ্বাসে তাকে আঁকড়ে ধরে তার ভিতরে মানসিক-ব্যবহারিক নিরাপত্তা আর শান্তি খোঁজবার প্রবণতাও কম বলশালী নয়। নিজেকে বদলানো এবং পরিবেশকে বদলানো মানুষের শুধু সাধ্যায়ত্ত নয়, সেদিকেই তার স্বাভাবিক সমাসক্তি। অপর পক্ষে, মানুষের রক্ষণশীলতা, তার অচলায়তনিক মোহ, সংকীর্ণ গণ্ডি এবং নির্দিষ্ট অবস্থানের প্রতি আনুগত্য মোটেই প্রচ্ছন্ন নয়। সবচাইতে গভীরতম বিরোধ হল সেই দুটি মূল বৃত্তির ভিতরে ফ্রয়েড যাদের চিহ্নিত করেছিলেন ইরস (EROS)-বৃত্তি ও মৃত্যুবৃত্তি বলে। ইরস বা জীবনবৃত্তি মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির অনুরাগ, মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততি নিয়ে পরিবার রচনা, অনেক পরিবার







নিয়ে গোষ্ঠী, অনেক গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক-বিন্যাস থেকে উদ্ভূত সমাজ, বিভিন্ন সমাজের সমবায়ে এক-একটি বিকাশশীল সভ্যতা—এসবের ভিতরে মানুষের জীবনবৃত্তি সক্রিয়। অপর পক্ষে, নিজের উপরে নিগ্রহ এবং অপরের উপরে অত্যাচার, একা অথবা দলবদ্ধভাবে দুর্বল ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজকে আক্রমণের প্রবণতা, যুদ্ধবিগ্রহ, ধ্বংসের কাজে শক্তি আর সম্পদের বিনিয়োগ—এসব মৃত্যুবৃত্তির প্রকাশ। প্রাণের আশ্রয় যে রূপ তার রক্ষণ, পোষণ ও বিকাশ ইরসবৃত্তির ধর্ম। সেই রূপকে প্রাণহীন, চেতনাহীন জড়তায় পর্যবসিত করার দিকে মৃত্যুবৃত্তির প্রবণতা। ব্যক্তির জীবনে এবং মানুষের ইতিহাসে এই দুই বৃত্তির সংঘাত নিয়তই দৃশ্যমান। সুস্থ অবস্থা তাকেই বলা চলে যেখানে সাময়িকভাবে হলেও মৃত্যুবৃত্তিকে অনেকটাই সংহত করে জীবনবৃত্তি প্রাধান্য পেয়েছে। রূপমাত্রেরই কালক্রমে জীর্ণন এবং বিনাশ যেমন অবশ্যম্ভাবী, মানুষের ভিতর থেকে মৃত্যুবৃত্তিও সম্ভবত তেমনই অমুচ্ছেদ্য। তবে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু আছে বলে সুস্থ জীবন অসাধ্য বা অকাম্য নয়। সেটাই সুস্থ সমাজ এবং সভ্যতা যেখানে রীতিনীতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, ব্যবহারসম্পর্কাদি জীবনবৃত্তির সম্পোষক।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে—সমাজসংস্কৃতি মাত্রই তো জীবনবৃত্তি থেকে উদ্ভূত এবং সেইহেতু তার ধারক। অবশ্যই জীবনবৃত্তির তাগিদে মানুষ পরস্পরে যুক্ত হয়, সমাজ গড়ে তোলে। কিন্তু সমাজসভ্যতা রূপ নেবার পর সেখানে নানাভাবে মৃত্যুবৃত্তির সমর্থন প্রবল হয়ে উঠতে পারে। দু-একটি দিকের কথা উল্লেখ করি। প্রকৃতিপরিবেশের ভিতরে যে সম্পদ বিরাজমান, তাকে প্রাজাতিক উন্মেষের কাজে নিযুক্ত করার ফলে সমাজসভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এমন প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে যখন মানুষ নির্বিকারে প্রকৃতির সম্পদ লুঠ করে নিজের ভোগের মাত্রা বাড়িয়ে চলে। তার ফলে পরিবেশের রূপান্তর যে মানুষের পক্ষেই ধ্বংসমুখী হয়ে উঠছে তা খেয়াল করে না। অরণ্যকে ধ্বংস করে সেখানে নিষ্পাদপ নগরপত্তন করার ফলে কোনো-কোনো অঞ্চল মরু-ভূমিতে পর্যবসিত হয়েছে, ইতিহাসে এমন দুর্ঘটনা মোটেই দুর্লভ নয়। জীবনরক্ষা এবং তার বিকাশের জন্য প্রকৃতিপরিবেশের সঙ্গে সংগতি একটি অনতিক্রম্য শর্ত। এই শর্ত না মানলে পরিবেশ যেমন প্রতিকূল হয়ে ওঠে, তেমনি মানুষের ভিতরেও অনাক্রম্যতা কমে আসে, অপচিতি বেড়ে যায়। আমাদের যুগে এই দিকটি ভয়ঙ্করভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

আবার সমাজসভ্যতায় শ্রমের বিভাজন যত জটিল এবং ব্যাপক হয়ে ওঠে ততই সমাজে কিছু চতুর ও সুসংগঠিত উনজন নিপুণ ব্যবস্থাদি উদ্ভাবন করে বিরাট অধিজনকে শোষণ করতে থাকে। অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষ তাদের শ্রমের ফলের খুব কম অংশই নিজেরা ভোগ করতে পায়; বেশিটাই যায় তাদের ভোগে যারা সমাজসভ্যতার পরিচালক আর ধারক। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, মৌলবী-মোল্লা, রাজা-জমিদার, দেওয়ান-গোমস্তা, আমলা-পুলিশ, শস্ত্রধারী এবং শাস্ত্রবিদ থেকে শুরু করে বণিক ব্যবসায়ী, মহাজন মুৎসুদ্দি, খনি, চা-বাগান কলকারখানার মালিক ম্যানেজার, রাজনৈতিক নেতা এবং বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের কর্তা—এঁরা সকলেই নিজেদের বিত্তসম্পত্তি, সুযোগসুবিধা, প্রতাপপ্রতিপত্তি বাড়িয়েই চলেন, এবং অধিকাংশ মানুষ তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সমাজসভ্যতা যেমন সহযোগের প্রকাশ, তেমনি তার ভিতরে নিয়তই স্বার্থজনিত দ্বন্দ্ব সংঘাত চলে। প্রচ্ছন্ন-ভাবে অথবা প্রকাশ্যে এই সংঘাত মুখ্যত ক্ষমতা- ও সুবিধাভোগী সংখ্যাল্প জনের সঙ্গে বঞ্চিত সংখ্যাগুরু জনের। তা ছাড়া, উনজনদের ভিতরেও ক্ষমতার প্রতিযোগিতা সংঘাতের আকার নেয়। অনেক সময়েই উপরতলার একদলকে হারিয়ে বা হঠিয়ে আরেকদল উপরতলা দখল করে। কিন্তু দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে, নীচের তলার মানুষদের উপরে উপরতলার মানুষদের শোষণ এবং শাসন বন্ধ হয় না। সভ্যতার এই শোষণভিত্তিক

চরিত্র মানুষের ভিতরকার মৃত্যুবৃত্তিকে প্রবলতর করে।

তাছাড়া, প্রকৃতি-পরিবেশ এবং অধিজনকে শোষণ করে যে সমাজসভ্যতা গড়ে ওঠে তা অধিকাংশ সময়েই নিজের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। তা অন্য সমাজ-সভ্যতাকে নিজের আয়ত্তাধীন করতে চায়, তার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানবীয় শ্রমশক্তিকে আপনার ভোগসম্ভাবনাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োগ করতে চায়। মানুষের আগ্রাসী বৃত্তি এই অবস্থায় মহা প্রবল রূপ ধারণ করে। শুরু হয় এক দেশ এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য দেশ এবং রাষ্ট্রের যুদ্ধ। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে দুই মহা হত্যাকাণ্ডের মহাকাব্যিক বিবরণ আছে রামায়ণে এবং মহাভারতে। রাম-রাবণ যুদ্ধের শেষে লঙ্কেশ্বরের একলক্ষ পুত্র আর সোয়ালক্ষ নাতির কেউই বংশে বাতি দেবার জন্য অবশিষ্ট রইল না। একটি প্রভবিষ্ণু সভ্যতার বিলোপ ঘটল। এবং অবতার শ্রীকৃষ্ণ অনিচ্ছুক অর্জুনকে মহাহত্যাকাণ্ডে প্রবৃদ্ধ করবার জন্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মতো উদ্দীপক দার্শনিক কাব্য রচনা করলেও যুদ্ধাবসানে কুরুক্ষেত্রে যে মহাশ্মশানে পর্যবসিত হয়েছিল তাতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। আমাদের শতকে দুই মহাযুদ্ধে যত লোকক্ষয় হয়েছে ইতিহাসে তা তুলনারহিত। সম্প্রসারণের উৎকাঙ্ক্ষা সভ্যতাকে আগ্রাসী করে তোলে, মানুষের মৃত্যুবৃত্তিকে পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক হত্যাকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করে।

প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে অসংগতি, শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রচালিত আগ্রাসননীতি যেমন ধ্বংসের প্রবণতার পরিপোষক, তেমন নানা রকমের নিরোধ, ব্যর্থতা এবং আঘাত বহু স্ত্রীপুরুষকে ধর্ষকাম এবং/অথবা মর্ষকাম করে তোলে। সমাজ-সভ্যতা যেমন মানুষকে অনেকটা নিরাপত্তা দেয় তেমনি ব্যক্তির উপরে শিশুকাল থেকেই বিস্তর বিধিনিষেধও চাপায়। এইসব বিধিনিষেধ অনেক সময়ে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থপ্রণোদিত, প্রায় সময়েই তাদের অমান্য করলে গুরুতর শাস্তির ভয় থাকে। নিরোধের প্রাবল্য মৃত্যুবৃত্তিকে মদত জোগায়। যে সমাজ-সভ্যতায় নিষেধ, নিরোধ সর্বচাইতে আন্তীর্ণ এবং শাস্তিশক্তি প্রচণ্ড সেখানে মর্তুকাম এবং জিঘাংসু প্রতিস্পর্ধাও খুব ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ এবং ক্রিয়াশীল।

ফলত এখন থেকে ষাট বছর আগে সিগমুনড ফ্রয়েড যে প্রশ্ন তুলেছিলেন তা আজ আরো বেশি প্রাসঙ্গিক। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত *Civilization and its Discontents* গ্রন্থে ফ্রয়েড লিখেছিলেন :

> The fateful question of the human species seems to me to be whether and to what extent the cultural process developed in it will succeed in mastering the derangements of communal life caused by the human instincts of aggression and self-destruction.

শতাব্দীর শেষ দশকে পৌঁছে আমরা কি মানুষের আগ্রাসী আর আত্মঘাতী বৃত্তিকে সংযত করবার দিকে একটুও এগিয়েছি ?

## দুই

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সমাজ-সভ্যতার বিচিত্র প্রবাহ এবং ওঠাপড়া আজও চলেছে। তবু এটাই অস্পষ্ট নয় যে বিশ শতকে আমরা এমন একটি অবস্থায় পৌঁছেছি যখন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আর পরস্পর থেকে অসম্বদ্ধ নেই। আমাদের যুগের সম্ভবত সবচাইতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এটাই যে মানুষের প্রাজাতিক ও সার্বজনিক ভাগ্য আর কথার কথা নয়। ইতিহাসে এই প্রথম প্রত্যেকটি সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অন্য সব কটি দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ- বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। আর কিছু না হোক প্রাজাতিক বিকলাঙ্গতা বা বিনাশের সমূহ আশঙ্কা আজ পৃথিবীর সর্বত্র ছায়া ফেলেছে।

ব্যাপারটি সম্প্রতি খুব পরিস্ফুট হলেও বিশ শতকের চৌহদ্দির ভিতরেই এটি সীমাবদ্ধ নয়।







ইতিহাসে যাকে আধুনিক যুগ বলা হয় তার উদ্ভব এখন থেকে কয়েকশো বছর আগে পশ্চিম ইয়োরোপে। আগেকার দিনে যেসব সাম্রাজ্য এবং সভ্যতার ওঠাপড়া দেখি তাদের ব্যাপ্তি ছিল ভৌগোলিক দিক থেকে সীমাবদ্ধ—সারা পৃথিবীতে সম্প্রসারিত হবার মতো সামর্থ্য তাদের ছিল না যোলো শতক থেকে এই অবস্থায় পরিবর্তন শুরু হয়। রেনেসাঁস পশ্চিম ইয়োরোপের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলে; নতুন জীবনবোধ, ভাবনাচিন্তা, উদ্ভাবন আবিষ্কার, প্রণালী-প্রযুক্তি ইয়োরোপের বিভিন্ন সমাজে আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটাতে থাকে। ইয়োরোপের উদ্যোগী-জন ছড়িয়ে পড়ে মহাসমুদ্রের দুস্তর বাধা অতিক্রম করে বহু দূরবর্তী দেশে-দেশে। সেখান থেকে নিয়ে আসে কখনো বা লুঠ করে সোনাদানার সঞ্চয়, কখনো বাণিজ্যসূত্রে বিচিত্র উৎপন্ন। গড়ে উঠতে থাকে নতুন আদলের এক সভ্যতা যার নির্ভর ভৌত বিজ্ঞানাদির নাটকীয় বিকাশ, সেই নবলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে নিত্যনতুন পদ্ধতি-প্রযুক্তির উদ্ভাবন, সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়ক রীতিনীতি, কলকৌশল, সংগঠন-সম্পর্ক-বিন্যাসের বিস্তার। আঠারো এবং উনিশ শতকে যন্ত্রবিপ্লবের ফলে শুধু যে পশ্চিম ইয়োরোপের প্রধান কয়েকটি দেশের আধিপত্য পৃথিবীর দূর-দুরাঞ্চলে ছড়িয়ে যায় তাই নয়, নতুন এই সভ্যতার আদল পৃথিবীর সর্বত্রই নিজের ছাপ কমবেশি ফেলতে সমর্থ হয়। বিশ শতকের দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব নগর-কেন্দ্রিক, প্রযুক্তিনির্ভর, সম্প্রসারণশীল এই আধুনিক সভ্যতাকে বিশ্বব্যাপী করেছে।

এই নবসভ্যতার প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারে সমাজের যে অংশ প্রধান ভূমিকা নেয় তার নাম বুর্জোয়াজি, বা নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী। দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারক-উদ্‌ভাবকরা জ্ঞানকে নির্ভরযোগ্য এবং সম্প্রসারিত করেন, মানুষের দক্ষতা এবং ক্ষমতাকে বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে থাকেন। আর সেই জ্ঞান এবং সামর্থ্যকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগায় বুর্জোয়াজি। মার্কস লিখেছিলেন বুর্জোয়ারা চায় জগৎকে নিজের আদলে গড়তে; এবং জগতের অন্য অধিবাসীদের কাম্য যাই হোক না কেন, জগৎ যে শিল্পবিপ্লবের ফলে বুর্জোয়ায়নের দিকেই এগিয়েছে এবং এগোচ্ছে এটা স্পষ্ট। জগতের অধিজন এখনো কৃষিনির্ভর এবং গ্রামবাসী; বিভিন্ন সমাজের ভিতরে পার্থক্য এবং অসাম্য অবশ্যই বিদ্যমান; কিন্তু পশ্চিমী প্রতাপের সম্প্রসারণ এবং যন্ত্রবিপ্লবের ফলে প্রায় সর্বত্রই নগরের আধিপত্য গত দুশো বছরে প্রবলভাবেই প্রতিষ্ঠিত। গ্রামাঞ্চলকে শোষণ করে নগরগুলি স্ফীতকায় হয়ে ওঠে; আধুনিক শিক্ষার প্রসার এবং সমাযোজন-পরিবহণের (communication and transport) ব্যাপক উন্নতির ফলে গ্রামের মানুষ শহরের অনুকরণ করতে চায়। সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ একই সময়ে ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চলে বর্তমান থাকলেও জনপদের একটি বিশেষ রূপই আধুনিক কালের অধিনায়ক।

সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের এবং বিশেষভাবে পশ্চিমের প্রাধান্যবিস্তারের হেতুনির্ণয় কঠিন নয়। বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পশ্চিম ইয়োরোপ দীর্ঘকালব্যাপী অচলায়তনিক জড়তা, জিজ্ঞাসারিক্ত নির্দেশনির্ভরতা, ব্যাপক দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতা, পৌনঃপুনিক প্লেগ-মহামারীর হাত থেকে উদ্ধার পায়। গ্রামের তুলনামূলকভাবে স্থবির, সীমাবদ্ধ, অল্পেতুষ্ট, পরম্পরা-নিয়ন্ত্রিত, কৃষিনির্ভর সমাজ ও আর্থব্যবস্থার পক্ষে উদ্যোগী বুর্জোয়াচালিত শহরের জঙ্গম, সম্প্রসারণশীল, নিত্য-অতৃপ্ত, উদ্ভাবন-সমর্থক, প্রযুক্তিনির্ভর প্রবল শক্তিকে রোধ করা সম্ভব ছিল না। নগরায়ণ এবং যন্ত্রবিপ্লব পশ্চিম ইয়োরোপকে আধুনিক কালে পৃথিবীর কেন্দ্রে স্থাপন করে; পৃথিবীর যে-যে অঞ্চলে বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে নি অথবা সে শ্রেণী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি সেই-সেই অঞ্চলে পশ্চিম ইয়োরোপের বুর্জোয়াজি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। আমরা যারা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের

ভুক্তভোগী তাদের পক্ষে একান্তভাবে সাম্রাজ্যতন্ত্র-বিরোধী হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এটাও প্রত্যক্ষ যে বুর্জোয়া নেতৃত্বে যন্ত্রবিপ্লবের ফলে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি অভূতপূর্ব মাত্রায় বেড়েছে এবং এখনো বাড়ছে; যে উদ্‌বৃত্ত বৃদ্ধির ফলে মানুষের ঐহিক জীবনযাত্রার মানে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে; যে মৃত্যুহার কমার ফলে জনসংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে গেছে এবং গড়পড়তা মানুষ অনেক বেশি দিন বাঁচছে; যে সমাযোজন এবং পরিবহণের বৈপ্লবিক বিকাশের ফলে পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে অন্য প্রান্তের মানুষের যোগ আজ সহজতর হয়েছে। এই রূপান্তর সকলের তারিফ না পেতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর সব অঞ্চলেই যে এই রূপান্তরের কমবেশি প্রভাব পড়েছে এবং সে প্রভাব এখনো বর্ধমান তা সম্ভবত কেউই অস্বীকার করবেন না।

নগরায়ণ এবং শিল্পবিপ্লব মানুষের ঐহিক সমৃদ্ধি-সাধন করেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মৃত্যুবৃত্তি এবং ধ্বংসসামর্থ্যকেও যে প্রবলতর করেছে সেটা সূচনাকালেও একেবারে অজানিত ছিল না। আমাদের শতকে সে দিকটি ভয়ঙ্করভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। উদ্যোগের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে ছিল আগ্রাসী-বৃত্তি; প্রযুক্তির একটি বড়ো অংশ জুড়ে ছিল ধ্বংসাস্ত্রের নিত্যনূতন উদ্ভাবন: প্রাকৃতিক উপকরণ এবং শক্তির মতো মানুষকেও উপাদানে ও যন্ত্রে পর্যবসিত করার প্রবল প্রবণতা অনুস্যূত ছিল নগরায়ণে এবং শিল্প-বিপ্লবে। ইতিহাসে যুদ্ধ কিছু নতুন ব্যাপার নয়; কিন্তু আধুনিক কালে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আর ভৌগোলিক পরিধির বিস্তার এবং মারণায়ুধের পরিকর্ষ যুদ্ধকে দানবীয় আকার দেয়। আমরা এখন এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যেখানে আগ্রাসীবৃত্তি এবং বিনাশসামর্থ্যের সম্মিলিত প্রয়োগে মানবপ্রজাতির বিলোপ আর অকল্পনীয় নয়।

উনিশ শতক জুড়ে পশ্চিম ইয়োরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলকে প্রত্যক্ষ- অথবা পরোক্ষভাবে তাদের কর্তৃত্বাধীন করে রেখেছিল। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রধান অংশ লুঠ করে এবং পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষকে শোষণ করে পশ্চিম ইয়োরোপ জগতের সবচাইতে সমৃদ্ধিশালী এলাকা হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের আগ্রাসীবৃত্তি কোনো সীমা মানতে রাজি ছিল না। সাম্রাজ্যতন্ত্রে-সাম্রাজ্যতন্ত্রে মহাযুদ্ধ বাধে; দুই মহাযুদ্ধের ফলে পশ্চিম ইয়োরোপের সাম্রাজ্যতন্ত্রগুলি শূন্যগর্ভ হয়ে পড়ে এবং বিশ শতকের মধ্যভাগে একে-একে বিলুপ্ত হয়। অনেকে যেটিকে ইতিহাসে ভাস্কোডাগামা যুগ বলে চিহ্নিত করেন, আপাতদৃষ্টিতে বিশ শতকের মধ্যভাগে সেটির অবসান ঘটে। তবে এশিয়া-আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ স্বাধীন হয় বটে, কিন্তু যেসব ত্রুটির ফলে একদা তারা পরাধীন হয়েছিল—উদ্যম, নির্ভরযোগ্য জ্ঞান, ঐক্য, বিকাশধর্মী সংগঠন এবং প্রযুক্তি ইত্যাদির অভাব—সেগুলি দূর না হওয়ার ফলে তাদের ভিতরে অনেকেই স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও দরিদ্র, দুস্থিত এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ রয়ে গেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে ১৯৮৮ সালে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের (মোজাম্বিকের) জাতীয় উৎপন্নের (GNP) মাথাপিছু পরিমাণ ছিল ১০০ মার্কিন ডলার; সমৃদ্ধতম দেশের ২৭৫০০ ডলার। ওই বছর পৃথিবীর শতকরা ৫৭ ভাগ স্ত্রীপুরুষের যে দেশগুলিতে বাস, সেখানকার মাথাপিছু জি. এন. পি. ৩২০ ডলার; আর শিল্পবিপ্লবোত্তর সংখ্যাল্প দেশগুলির ১৭৫৮০ ডলার। এই আর্থিক অসাম্য ক্রমেই বির্বধমান; এবং শুধু ধনী এবং দরিদ্র দেশগুলির পাস্পরিক সম্পর্কে নয়, যে দেশগুলি এখন শিল্পায়নের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত, সেগুলির অভ্যন্তরেও এই অসাম্য হ্রাস পাবার আভিমুখ্য দেখা যায় না। ভারতবর্ষে আজও অর্ধেকের বেশি লোক তথাকথিত দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, এবং তাদের ভিতরেও অর্ধেকের বেশি লোক "অতিদরিদ্র" বা নিঃসম্বল।

প্রযুক্তির উৎকর্ষ এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির দ্রুত বৃদ্ধি সত্ত্বেও পৃথিবীব্যাপী এই অসাম্য আধুনিক সভ্যতার অসুস্থতার একটি প্রধান লক্ষণ। এই শতকের দ্বিতীয় পাদে এই অসাম্য দূর করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে একটি বিকল্প ব্যবস্থার পরিকল্পনা দেশে-দেশে শিক্ষিত সাধারণের একটি বড়ো অংশকে আকৃষ্ট করেছিল। মার্কসের সমাজদর্শন তাঁর জীবদ্দশায় ইয়োরোপে অথবা ইয়োরোপের বাইরে লক্ষণীয় কোনো প্রভাব ফেলে নি। কিন্তু বলশেভিকরা রাশিয়ার মতো বিরাট দেশে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করবার পরে তাদের প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশন্যালের মাধ্যমে লেনিন-স্টালিন-ব্যাখ্যাত মার্কসতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরেও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সেই প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায় মহাচীনে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করবার পরে। কিন্তু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে দেখা গেল—আর্থিক দিক থেকে এই বিকল্প অনুন্নত দেশে জবরদস্তি করে বিলম্বিত শিল্পবিপ্লব ঘটানোর বড়ো জোর একটি উপায় মাত্র। সামাজিক অসাম্য এবং অসুস্থতা দূর হল না। উপরন্তু বহু স্ত্রী পুরুষকে হত্যা করে অথবা শ্রমদাসে পর্যবসিত করে দেশের যেটুকু আর্থিক উন্নতি ঘটানো হল তার চাইতে বেশি সাফল্যের সঙ্গে ঘটল মারণাস্ত্রের উৎকর্ষ এবং প্রাবল্য, ক্ষমতার অভূতপূর্ব কেন্দ্রায়ন, স্বাধীন চিন্তা এবং প্রকাশের বিলোপ। কোথায় সেই 'নব সভ্যতা' ওয়েব দম্পতি একদা উচ্ছ্বসিত হয়ে যাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন? এই বিকল্পের ব্যর্থতা সম্প্রতি কালে সর্বস্বীকৃত। রাশিয়াতে স্তালিন এবং মহাচীনে মাও-এর বিচারোর্ধ্ব প্রাধিকার আজ সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত। পূর্ব ইয়োরোপে লাল ফৌজের ছত্রছায়ায় যেসব তাঁবেদার কমিউনিস্ট জুলুমতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গণবিক্ষোভের ধাক্কায় তাসের প্রাসাদের মতো তারাও ভূমিসাৎ হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন নিজেই নানা সংশয়ে, অন্তর্দ্বন্দ্বে, কেন্দ্রাতিগ আভিমুখ্যের টানে, নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিলে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র কমিউনিস্ট বিকল্পের আকর্ষণ সম্প্রতি বিলীয়মান; এখানেও যে দল ক্ষমতাসীন সেটি নিজেকে মার্কসপন্থী বলে পরিচয় দিলেও বুর্জোয়া সভ্যতার বিকল্প নিয়ে সেটিও বড়ো একটা উচ্চবাচ্য করে না। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে টাটা-বিড়লা-গোয়েঙ্কার সহায়তা নিয়ে যদি নিজের দখলতি বজায় রাখতে পারে তাতে সে দলের কোনো আপত্তি নেই।

বহির্জগতে সহিয়েট রাশিয়া এবং মহাচীনের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রায়-বিগত। সাম্রাজ্যবিহীন পশ্চিম ইয়োরোপের আর্থিক রাষ্ট্রিক অবস্থায় সবিশেষ উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ইয়োরোপের বাইরে তার দাপট লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু বুর্জোয়া-সঞ্চালিত আধুনিকীকরণ-প্রক্রিয়া এখনো পর্যন্ত সমানভাবেই অব্যাহত। বস্তুত পশ্চিম ইয়োরোপের সাম্রাজ্যগুলির অবলুপ্তি এবং সহিয়েট সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের ফলে এখন আধুনিকীকরণের প্রায় একচেটিয়া দায়দায়িত্ব বর্তেছে মার্কিন রাষ্ট্র এবং সেখানকার বুর্জোয়াজির উপরে। তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জাপানের আর্থিক প্রাযুক্তিক বিকাশ সত্ত্বেও আয়ুধ-উচ্ছ্বয় নিষিদ্ধ থাকার ফলে বহির্জগতে প্রতিপত্তি এখনো সীমাবদ্ধ। অপর পক্ষে, বিপুল বিত্তসামর্থ্য, বিরাট ও বিবর্ধমান সমরসম্ভার, উদ্‌বৃত্তের বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ, মহাকায় রাষ্ট্রিক-আর্থিক সংগঠন এবং অপত্রপ ও অবিশ্রান্ত আত্মপ্রচার—সব মিলে মার্কিন প্রতাপ-প্রভাবকে প্রায় অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। নিউ ইয়র্ক এবং লস এঞ্জেলসে যখন যে প্রভাব চালু, সেখানে ছবির, গানের, সাহিত্যের, জীবনযাত্রার পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্কের রীতিনীতির, পোশাক-আশাকের মায় চুলছাঁটা এবং মাথা চাঁচার যেসব পালাবদল ঘটে, অল্পকালের ভিতরেই পরাক্রান্ত প্রচারমাধ্যমের দৌলতে তা শুধু পশ্চিমের দেশগুলিতেই ছড়িয়ে যায় না, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, এবং আফ্রিকার উদ্‌ভ্রান্ত অধিবাসীদের অনেকেই তার অনুসরণ করে। এমনকী সম্প্রতি কালে রাশিয়া এবং মহাচীনেও মার্কিনি মডেলের অনুসরণ ব্যাপক হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদেরও স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে "ঈশ্বরের আপন দেশে" প্রব্রজন, অন্যথায় স্বদেশে মার্কিনি সভ্যতার প্রবর্তন।

বলশেভিক রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী জুলুমতন্ত্রের অবসান হয়তো এই শতকের ভিতরেই ঘটবে, কিন্তু মার্কিনের নব সাম্রাজ্যতন্ত্রের ঘোর অসুস্থতাও আজ প্রচ্ছন্ন নেই। বস্তুত, বুর্জোয়াচালিত আধুনিকতার ভিতরে উদ্যোগের সঙ্গে যে ধ্বংসবৃত্তি অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল মার্কিন নেতৃত্বে তার বিকট চেহারাটি আজ প্রত্যক্ষ। অধিকাংশ দেশের অধিকাংশ মানুষের নিতান্তই যা প্রয়োজনীয় তাও মেটাবার ব্যবস্থা আজও সুদূরপরাহত; কিন্তু বিশ্বের সম্পদের খুব বড়ো অংশ মার্কিন রাষ্ট্র নিযুক্ত করেছে শস্ত্রোদ্ভাবনে, মারণাস্ত্র উৎপাদনে। ইরাকের ডিক্টেটর সাদ্দাম হুসেনকে শাস্তি দেওয়ার নামে সে দেশের রাজধানী এবং অন্যান্য শহরে, কলকারখানায়, হাসপাতালে, স্কুলেবাজারে, পথেঘাটে যেভাবে আকাশ থেকে লক্ষ-লক্ষ বোমা ফেলা হয়েছে পরিমাপে তার সমতুল্য নৃশংসতা হিরোসিমা-নাগাসাকির পরে আর দেখা যায় নি। মার্কিন সরকারের নিজের দেওয়া হিসেব অনুসারে এই স্বল্পকালস্থায়ী যুদ্ধে সামরিক বিমান পাঠানো হয় এক লক্ষ ছয় হাজার বার, বোমা ফেলা হয় ৮৮,৫০০ টন, তার ভিতরে শতকরা সত্তর ভাগ লক্ষ্যভেদ না করে আশেপাশে পড়ে। কিন্তু যেহেতু স্বদেশীয় প্রায় সাত লক্ষ সৈন্যের বিরাট সমাবেশকে একরকম অক্ষত রেখে স্রেফ আকাশপথে হত্যাস্ত্রের প্রাচুর্যের তাকতে সামরিক-বেসামরিক ইরাকিদের নির্বিচারে নিধন করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন, মার্কিন দেশে তাঁর জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। মার্কিনি নেতৃত্বে খুব নগ্নরূপে আবার উদ্‌ঘাটিত হল যে সমকালীন রুগ্ন সভ্যতার কেন্দ্রে আছে মানুষের মরণবৃত্তির উদ্দীপন আর প্রবর্ধন। আসলে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, দলের সঙ্গে দলের, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা এবং মানবিক পরিবেশকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আধিপত্যে আনা, ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন এবং ক্ষমতাবৃত্তের সম্প্রসারণ, লোভ এবং ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে ক্রমাগতই বাড়িয়ে তোলা—এ সবই সমকালীন সভ্যতার সাধ এবং সাধনার বিষয়। আর এই সাধনায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে "ঈশ্বরের আপন দেশ"।

সমকালীন সভ্যতার নিরঙ্কুশ, নির্বিবেক আগ্রাসিতার প্রকোপে আমাদের দশকে শুধু দুটি বিশ্বব্যাপী মহাহত্যাকাণ্ড ঘটে নি, গত চল্লিশ বছরে মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামূহিক অস্তিত্বের বিনাশ-শঙ্কাও প্রবলতর হয়ে উঠেছে। আজকের দিনের স্ত্রী-পুরুষ ক্রমেই বিচ্ছিন্নতাতাপীড়িত, নির্বেদ-আক্রান্ত, আত্ম-প্রত্যয়হীন, শুভ-অশুভ নির্ণয়ে অসমর্থ, ধর্ষকাম এবং মর্ষকাম বৃত্তির প্রাবল্যে বিকলচিত্ত, রাজনৈতিক বুলি এবং ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের অসহায় বলি হয়ে উঠছে। পরিবার এবং সমাজ ভেঙে পড়ছে; স্নেহ, বন্ধুতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, মানুষে মানুষে নির্ভরযোগ্য সম্পর্ক দ্রুত দুর্লভ হয়ে উঠছে; অসহিষ্ণু, উগ্র, আক্রামক ধর্মান্ধতা শূন্যগর্ভ জনতাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করছে। মানুষের উদ্ভাবিত ও নির্মিত পারমাণবিক ও জৈব-রাসায়নিক অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভাব্য প্রয়োগ আজ প্রাজাতিক ভবিষ্যতের মাথায় ভয়ংকর প্রশ্নচিহ্ন হয়ে ঝুলছে। মানুষ আজ যেভাবে সর্বত্র বিচারবিবেচনাহীন প্রাবল্যে পরিবেশদূষণ করে চলেছে তা যদি আমাদের দশকে বন্ধ না করা যায় তাহলে একুশ শতকের পৃথিবীতে শুধু মানুষ নয়, সম্ভবত অধিকাংশ প্রাণীরই বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

সম্প্রতি আমার একটি অসমাপ্ত এবং অপ্রকাশিত কবিতার খসড়ার সূচনাংশে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমার উদ্বেগ এভাবে আকার পেয়েছে :

> সন্তর ছুঁই ছুঁই, শুকনো ডালপালা, শিকড়ে সময়ের পিঁপড়ে/বাঁধছে চাক, জানি ধুবড়ে পড়তে একটি ঝঞ্ঝার ওয়াস্তা।/ওদিকে ঘনঘোর আঁধার জমছে পৃথিবী জুড়ে







> নৈরাশ্য,/একটি গাছ নয় বনের পর বন হননশঙ্কায় স্তব্ধ।
>
> আমার মৃত্যুতে কার কী আসে যায়? কিন্তু সন্ততি ভাগ্য/বন্ধক রেখে যাব? আগ্নাসী মরু আর অন্ধ আকাশের আতি,/আবিল প্রবাহের উপরে তপ্ত হাওয়ার শ্বাসরোধী হলকা—/এই কী দায়ভাগ বইবে পিছনের বিপ্রলব্ধ প্রজন্ম?

## তিন

আমার প্রজন্মের আরো অনেকের মতো আমিও দীর্ঘকাল ধরে সুস্থ সমাজের সন্ধান করছি। ১৯৪৬ সালে যখন আমার দ্বিতীয় বই *Radicalism* লিখি তখন পুঁজিবাদী এবং বলশেভিক দুই ব্যবস্থার সমালোচনা করে বিকল্প হিসেবে তৃণমূল গণতন্ত্রের (Radical Democracy) কিছুটা আভাস দিয়েছিলাম। দু বছর পরে এলেন রায়ের সহযোগে রচিত *In Man's Own Image* বইটিতে এই বিকল্প চেহারাটি আরো পরিস্ফুট করবার চেষ্টা পাই। মার্কস, ফ্রয়েড, রাসেল এবং রবীন্দ্রনাথের পরে আমার চিন্তায় এবং জীবনযাত্রায় সবচাইতে প্রভাব ফেলেছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। ওই বই দুটিতে সেই প্রভাব আগাগোড়াই স্পষ্ট এবং স্বীকৃত। তারপর গত চল্লিশ বছরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এবং কেতাব-পত্রিকা, সেমিনার এবং চিঠিপত্রের সূত্রে জেনেছি এ দেশে এবং পৃথিবীর অন্যত্র বিচ্ছিন্ন অথবা যুক্ত ভাবে অনেকেই সুস্থ সমাজের সন্ধানে ব্যাপৃত। ফ্রোম, শুমেকার, ইলিচ, লেভি স্ট্রাউস, কার্ল পপার প্রভৃতি ভাবুকের বর্তিকা পথকে আলোকিত করেছে। যেসব ছাত্রছাত্রী, তরুণতরুণী বিত্তপ্রতিপত্তি অর্জন, আর্থিক-সামাজিক লাভলোকসানের হিসাব অথবা পদোন্নতির চেষ্টা না করে সরল জীবনযাপনে, অন্যের সেবায় বা ছোটো-ছোটো কমিউন গঠনে নিবেদিতপ্রাণ, তাঁদের কাছ থেকে মূল্যবান শিক্ষা লাভ করেছি। আগেই উল্লেখ করেছি মানব-ইতিহাস থেকে কোনো অনিবার্যতা তত্ত্বের সমর্থন মেলে না। মানুষের সামনে সব সময়েই কিছু বিকল্প থাকে। আমাদের যুগে যাঁরা সুস্থ সমাজের সন্ধান করেছেন তাঁদের সেই প্রয়াসের ভিতরে সম্ভবত নিহিত আছে এমন বিকল্পগ্রাম যা বুর্জোয়ায়ন বা মার্কিনায়নের প্রবল ধারাকে প্রতিহত করে সমাগত শতকে বিশ্বসঙ্কট থেকে উত্তরণের পথ দেখাবে।

সুস্থ সমাজ বলতে কী বুঝি? সংজ্ঞার্থ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করব না, তবে সুস্থতার যেসব লক্ষণ নিয়ে মতৈক্যের যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখতে পাই তাদের ভিতরে কয়েকটির উল্লেখ করি। অন্য জীবজন্তুর মতো মানুষও প্রকৃতির সন্তান; প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দের সঙ্গে নিজের জীবনযাত্রাকে মেলাতে না পারলে মানুষের ধ্বংসবৃত্তি প্রবলতর হয়; প্রকৃতি-পরিবেশকে রক্ষা করার দ্বারাই মানুষ নিজের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটাতে পারে। মানুষের অন্ধ লোভের আতিশয্য যখন প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গতি এবং পরস্পরনির্ভরতাকে প্রবলভাবে ব্যাহত করে তখন সমাজসংস্কৃতিতেও বিকৃতি দেখা দেয়। সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিটি শিশুকেই শেখানো দরকার—গাছপালা, পাখিপশু, মাটি, জল সকলেই তার আত্মীয়, তারা ভালোবাসার ধন, প্রয়োজন মেটানোর উপায়মাত্র নয়। তেমনই সুস্থ সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সহযোগের, প্রতিযোগের নয়; মৈত্রী, সততা, পারস্পরিক আস্থাই সুস্থ সমাজের ভিত্তি। যেখানে মানুষের প্রাজ্ঞাতিক জিজ্ঞাসাবৃত্তি এবং সৃজনী শক্তি সমাদৃত; প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষই স্বাধীন এবং মর্যাদাসম্পন্ন; কেউ অপরের দ্বারা শোষিত বা শাসিত নয়; যেখানে সামাজিক-পারিবারিক নিয়মকানুন জ্ঞান এবং যুক্তির দ্বারা পরিচালিত; যেখানে বৈচিত্র্যকে ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিলুপ্ত করা হয় না, বিকাশধর্মী ঐক্যের উপাদান হিসেবে তার মূল্য সমাজস্বীকৃত—সেটিই সুস্থ সমাজ।

সুস্থ সমাজের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বিবিধ উপায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন। প্রতি মানুষেরই কতগুলি সার্বিক এবং অপরিহার্য প্রয়োজন আছে—খাদ্যের,

বাসস্থানের, বস্ত্রের, শিক্ষার, নিরাপত্তার, রোগ-চিকিৎসার, সার্থক পরিশ্রমের, ভালোবাসা-মিত্রতা-শ্রদ্ধার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার, জিজ্ঞাসার, আত্ম-প্রকাশের, খেলাধুলার এবং বিনোদনের। লেখা বাহুল্য, এ তালিকা অসম্পূর্ণ, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এটিও মনে রাখা দরকার যে প্রকৃতির সম্পদ অফুরান নয়, জনসংখ্যাবৃদ্ধি এখনো পর্যন্ত প্রায় অনিয়ন্ত্রিত, এবং সব স্ত্রীপুরুষেরই অপরিহরণীয় প্রয়োজন মেটাতে হলে তালিকার স্বেচ্ছাকৃত সঙ্কোচনই বিবেচনার কাজ। সৌভাগ্যবশত ভালোবাসা, জিজ্ঞাসা বা খেলাধুলা বাহ্য সম্পদের উপরে নির্ভর করে না। সুস্থ সমাজে মানুষের সার্বিক প্রয়োজনের অধিকাংশই স্থানীয় উদ্যোগ এবং সম্পদের সঙ্গত ব্যবহারের দ্বারাই মেটানো সম্ভব। তার জন্য অবশ্য চাই স্থানীয় মানুষদের চিৎপ্রকর্ষ এবং স্বাধীন সংগঠন। রবীন্দ্রনাথ থেকে মানবেন্দ্রনাথ, লেভি স্ট্রাউস প্রমুখ বিশ শতকের অনেক ভাবুকই এই স্বনির্ভর ও সমবায়ী স্থানীয় সমাজসংগঠনকে সুস্থ ব্যবস্থার মডেল এবং ভিত্তি মনে করেছেন। এই ধরনের সংগঠন যত গড়ে উঠবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং দায়দায়িত্ব ততই কমবে, স্থানীয় স্ত্রী-পুরুষরাই তাঁদের সামূহিক সিদ্ধান্তগুলি নিজেরাই নিতে পারবেন। কেন্দ্রকল্পিত এবং নিয়ন্ত্রিত মহাকায় পরিকল্পনার জায়গায় স্থানীয় অধিবাসীরাই মিলিত হয়ে সামূহিক প্রয়োজনের পূর্বিতা এবং তাদের সামর্থ্যের হিসেব অনুসারে ছোটো-ছোটো পরি-কল্পনাকে বাস্তবায়িত করবেন। তাঁরা উদ্ভাবন এবং প্রতিষ্ঠা করবেন সেই ধরনের প্রযুক্তি এবং আর্থিক সংগঠন যেখানে বিপুল পুঁজিবিনিয়োগের চাইতে কর্মীদের নৈপুণ্য বা কারিগরিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব, যেখানে মুষ্টিমেয়ের ভোগবিলাস বা মুনাফার জন্য নয়, সর্বসাধারণের মুখ্য প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্যই সম্পদ আর শ্রমশক্তি নিয়োজিত। সেখানে বিবিধ সমস্যা এবং মতভেদের সমাধান খোঁজা হবে জ্ঞান, যুক্তি, পরীক্ষানিরীক্ষা এবং মিত্রতার সাহায্যে, বল-প্রয়োগ করে বা উত্তেজনা বাড়িয়ে নয়। সুস্থ সমাজের অধিবাসীরা বস্তুসামগ্রী সঞ্চয় অথবা বিলাসব্যসনের পরিবর্তে প্রকৃষ্টতর সুখের সন্ধান পাবেন বাহুল্যবর্জিত সরল জীবনযাত্রায়, প্রকৃতির ঋতুরঙ্গে, নক্ষত্রখচিত মহাকাশের অনিঃশেষ বৈভবে, নৃত্যসংগীত চারুকলা কাব্যকাহিনীর সর্বমানবীয় উত্তরলব্ধিতে, প্রেম স্নেহ শ্রদ্ধা বন্ধুতার সরস সম্পর্কাবলীতে। যা মানুষকে মানুষের, জীবজগতের এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়-সম্পর্কে যুক্ত করে, সুস্থ সমাজের অধিবাসীদের বিচারে তা-ই হবে কাম্য এবং সঙ্গত। যা বিযুক্ত করে, যা একের উপরে অন্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী, যার প্রবণতা সব কিছুকেই যন্ত্রে এবং উপায়মাত্রে পর্যবসিত করার দিকে, তাঁদের বিবেচনায় তা হবে অসঙ্গত ও বর্জনীয়।

সুস্থ সমাজের সন্ধানে বেরিয়ে এইসব লক্ষণের কথাই মনে রেখেছি। কিন্তু সমকালীন অসুস্থ সমাজ থেকে কীভাবে সেই সুস্থ সমাজের দিকে আমরা এগোব? চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যখন *Radicalism* এবং *In Man's Own Image* লিখি তখন কাম্য সমাজে পৌঁছবার পথ সম্পর্কে মনে খুব দ্বিধা-সংশয় ছিল না। এখন জানি—পথ মোটেই একটি নয়, এবং উত্তরণও হয়তো অনেকটা অনিশ্চিত। আপাতত কয়েকটি সম্ভাব্য পথের উল্লেখ করতে পারি। এদের ভিতরে প্রথম পথটি আমার বিবেচনায় অগ্রহণীয়, যদিও তরুণ মনে এটির আকর্ষণ সম্ভবত সমধিক। যে পথটি আমার কাছে উৎকৃষ্ট ঠেকে, সে পথে বিস্তর অধ্যবসায় এবং মতিস্থৈর্য দরকার।

প্রথমটি বিপ্লবের পথ। যাঁরা এই পথ বাছেন তাঁদের প্রধান যুক্তি হল যে বর্তমান ব্যবস্থায় যারা ক্ষমতাসীন তারা কখনো স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা এবং স্বার্থ ত্যাগ করবে না, শোষণ- এবং উৎত্রাসন-মুক্ত সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠার আগে তাদের উৎপাটিত করা জরুরি এবং তার জন্য বলপ্রয়োগ এবং রক্তক্ষয়ী সংঘাত অনিবার্য। বর্তমান শতকে রাষ্ট্রবিপ্লবে পৌনঃপুনিক





অভিজ্ঞতা এই পথের বিপদসংকুলতা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে। দেখা যায় বিপ্লবপ্রচেষ্টায় মানুষের আগ্রাসী বৃত্তিই প্রবলতর হয়, নির্মাণের চাইতে ধ্বংসের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, ক্ষমতাসীনদের উচ্ছেদ করে যারা ক্ষমতায় আসে তারা জনসাধারণ নয়, তারা শক্তিসাধক এবং সুসংগঠিত একটি দল যারা মানবমুক্তির নামে নিজেদের জুলুমতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। হয়তো যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় প্রকাশ্যভাবে জনমত গড়ে তুলে ক্ষমতাসীন-দের আদৌ সরানো সম্ভব নয় যেখানে রক্তক্ষয়ী বিপর্যয় ভূমিকম্পের মতো, হয়তো বিশেষ অবস্থায় তা অনিবার্য, কিন্তু সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় তা বেছে নেওয়ার ভিতরে বিবেচনার পরিচয় মেলে না। বিশেষ করে যখন এই শতকের অভিজ্ঞতা থেকে জানি ওই ধরনের বিপর্যয়ের ফল সর্বগ্রাসী জুলুমতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয় পথটি সংস্কারের পথ। কার্ল পপার এটির নাম দিয়েছেন piecemeal social engineering। সমাজের খোলনলচে একটানে বদলাবার চেষ্টা তাঁর মতে বুদ্ধিভ্রংশের পরিচায়ক। যে-কোনো ব্যবস্থাকেই খেপে-খেপে বদলালে ভুল শোধরাবার সুযোগ থাকে, জনমতকে সেই সংস্কারের পক্ষে টানা সহজতর হয়, বিপর্যয়জাত শূন্যতা এবং তারি সুযোগে জুলুমতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা থাকে না। এই ধরনের সমাজশোধন এবং ক্রমবিবর্তন সহিংস সংঘাতকে আদৌ প্রশ্রয় দেয় না। প্রকাশ্যভাবে আইনকানুনের সাহায্য নিয়েই সমাজের একটি-একটি করে ব্যাধি নিরাময় করা যায়। এই পথ বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আকর্ষণ করে, কিন্তু এটিও সমালোচনামুক্ত নয়। যে সমাজে সর্বগ্রাসী জুলুমতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী অবাধে উৎত্রাসননির্ভর, সেখানে সংস্কারের আন্দোলনও প্রকাশ্যে বা শান্তিপূর্ণ-ভাবে করা যায় না। এবং ছোটো-ছোটো সংস্কার ব্যাধির উচ্ছেদ না করে শোষণভিত্তিক ব্যবস্থাতেই স্থিতি এবং স্বীকৃতি এনে দিতে পারে।

তৃতীয় পথ অহিংস অসহযোগের এবং তারি সঙ্গে যুক্ত গঠনমূলক কর্মসূচীর। ভারতবর্ষে গান্ধী এই পথ অবলম্বন করেছিলেন, পরে মার্কিন দেশে মার্টিন লুথার কিং এবং পোল্যানডে ওয়ালেসা অনেকটা এই পথ অনুসরণ করেন। তাত্ত্বিক দিক থেকে এ পথের প্রধান গুণ হল অসহযোগের ফলে অন্যায় ব্যবস্থার নৈতিক এবং ব্যবহারিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে আসে, প্রতিষ্ঠিত শক্তির সঙ্গে সংঘাত ঘটলেও আগ্রাসী বৃত্তির প্রবর্ধন ঘটে না, গঠনমূলক কর্মসূচীর ভিতর দিয়ে সুস্থ সমাজের প্রস্তুতিপর্ব চলে। এ পথ অনেকটা পরীক্ষিত, এবং বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন বিবেকী জনের কাছে এটির আকর্ষণ অনস্বীকার্য। তবে ব্যবহারিক দিক থেকে এটির দুর্বলতাও অজ্ঞাত নয়। গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন বারবার অহিংসভাবে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকে নি। সত্যাগ্রহ যতদিন গান্ধীর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের ভিতরেই বিশেষ করে আবদ্ধ ছিল ততদিনই অহিংসার আদর্শ বজায় থাকে; কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা অসহযোগে যোগ দেওয়ার পরে সংঘর্ষ সহিংস হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বারবার মহাত্মাকে এই বিপত্তির বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। এবং গঠনমূলক কর্মসূচীতে শুধু খুব কম স্ত্রীপুরুষই যুক্ত হয় নি; গঠনের কাজ আগাগোড়াই অপুষ্ট রয়ে গেছে, শোষণব্যবস্থার পৃষ্ঠ-পোষণেই তা কিছুটা টিঁকে আছে।

চতুর্থ পথ নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং নিভৃত। দার্শনিক এপিকুরস শিষ্যদের বলেছিলেন, মালী হও, নিজের-নিজের জীবনে বাগান রচনা করতে শেখো। আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে এই নির্দেশকেই ঘুরিয়ে বলা চলে, নিজের চরিত্রে, জীবনে, ভাবনাচিন্তায়, সম্পর্কে ব্যবহারে আমরা প্রত্যেকেই সুস্থতার অনুশীলন করতে পারি; ক্রমে তা থেকেই হয়তো সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে। প্রকৃতিপরিবেশের যত্ন নিয়ে, স্ত্রীপুরুষশিশুবৃদ্ধ-নির্বিশেষে সব মানুষকে মূল্য দিয়ে তাদের সঙ্গে মৈত্রী-সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়ে, নিজের চিন্তা এবং আচার-আচরণকে জ্ঞানের দ্বারা চালিত করে, নিজের প্রয়োজনকে স্বেচ্ছায় কমিয়ে এনে, বস্তুসঞ্চয় এবং

বিলাসদ্রব্যের বদলে শিল্পসাহিত্যে অক্ষয় আনন্দের আস্বাদন করে, আগ্রাসীবৃত্তি ও ক্ষমতাস্পৃহাকে শমিত করে নিজের দেহমনকে নিরাময় করবার প্রয়াস আমার কাছে বিশেষ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন মনে হয়। অবশ্য এটি সহজসাধ্য নয়; যে অবস্থার ভিতরে আমরা বাস করছি তা এই প্রয়াসকে নিয়তই ব্যাহত করে; তবু তার ভিতরেই কবি কবিতা লেখে, চিত্রকর ছবি আঁকে, সেবাব্রতী সেবা করে, জিজ্ঞাসু জ্ঞানব্রতী হয়, বাউল 'মনের মানুষ' খুঁজে বেড়ায়। এ পথে নাটক নেই, আছে অনুশীলন। এ পথে ঈশ্বর, ইতিহাস অথবা জনতার সমর্থন লাগে না; লাগে নিষ্ঠা, সুবেদিতা, আত্মপ্রত্যয়। যারা নিজের এবং অব্যবহিত পরিবেশের উৎকর্ষ সাধনে সামর্থ্যের নিয়োগকে যথেষ্ট বিবেচনা করে এটি তাদের পথ।

আরো নানা পথ আছে, তবে এখানে যে পথটির উল্লেখ করে আপাতত এই আলোচনায় যতি টানব সেটিকে মানবেন্দ্রনাথ নব রেনেসাঁস নামে অভিহিত করেছিলেন। এটির মূলকথা সাধারণ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিচারবুদ্ধির উজ্জীবন, তারি নির্দেশে তাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনযাত্রার নিরূপণ, তারি ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন। রক্তাক্ত বিপ্লব, সীমাবদ্ধ পরিবর্জন, অহিংস অসহযোগ অথবা নিভৃত অনুশীলন থেকে এই পথ স্বতন্ত্র। এটির প্রধান ঝোঁক জনশিক্ষা এবং জনসংগঠনের উপরে। মানুষের বিচারবুদ্ধি, নীতিবোধ এবং সহযোগের উপরে দাঁড়িয়ে যে সমাজ গড়ে উঠবে সেখানে ক্ষমতা হবে বিকেন্দ্রিত, সম্পদ হবে সর্বসাধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং বিশ্বনাগরিকতা হবে প্রতিটি সমাজসংস্কৃতিতে পরস্পরের সম্পূরক। এই রেনেসাঁসের প্রবর্তনে বিশেষ ভূমিকা আছে সেই শিক্ষক ও সমাজসেবীদের যাঁরা ধনসঞ্চয় এবং ক্ষমতাকাঙ্ক্ষাকে সচেতনভাবে পুরোপুরি বর্জন করেছেন, যাঁরা প্রাজ্ঞ, যুক্তিবিবেকচালিত, অপরতন্ত্র এবং সর্বজনীন বিকাশ সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ।

এই শিক্ষক-সেবকরা কোথা থেকে কী ভাবে আসবে? প্লেটো তাঁর আদর্শ রিপাবলিকের জন্য দার্শনিক-শাসনকর্তাদের কথা লিখেছিলেন। নব রেনেসাঁসের এই শিক্ষক-সেবকরা আর যাই হোন কখনোই শাসনকর্তা হবেন না। তাঁরা উপদেষ্টা, কিন্তু পরিচালক নন। তাঁদের শিষ্যদের শিক্ষক-সেবক ভূমিকার জন্য উপযুক্ত করে তুলতে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং মানবেন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক-সেবকরা ছিলেন সংখ্যায় নিতান্তই অল্প, এবং তাঁদের উত্তরলব্ধি পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত বা প্রসারিত হয় নি। ফলে প্রশ্ন রয়েই যায়। এই প্রশ্ন এবং আরো অনেক প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্ন তো থাকবেই। তাই তো অনুসন্ধান।

শিবনারায়ণ রায়: র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট গোষ্ঠীর অতিপরিচিত মননশীল লেখক। ইংরাজি-বাঙলায় বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা; "জিজ্ঞাসা" ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদক। বর্তমানে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের তত্ত্বাবধানে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রচনাবলীর সম্পাদনায় ব্যাপৃত।



## গেরুয়া ব্রোকেডে তানপুরা

বিরাম মুখোপাধ্যায়

গীতবিতান-হপ্তার রুটিন শেষ—
রিক্‌শ চেপে সোমত্ত তানপুরা নিয়মমাফিক
নেমে পড়ে নাকউঁচু নিউরোডে নিজস্ব সদরে।
তান-লয় তালিমের যথাযথ নরম নিখুঁত 'ন'-এর
অনুপ্রাস বাজে কাঁদে দোতলায় নির্জন সকালে নিভৃত নিশীথে;
এককোণে বিলিতি পিয়ানো, টেম্পারা-দেয়ালে একছড়া শালিধান,
গগনেন্দ্র-তেলছবি, তরবারি-হাতে রানী দুর্গাবতী, দুর্গামুণ্ড,
কার্পেট-মেঝেয় বাঁকুড়ার ঘোড়া, শ্রীনিকেতনী মোড়া,
কিছু জয়শল্‌মির-মিনে, কিছু আলো-চেরা
জালি-টেরাকোটা, শোলাপুতুল সাজিয়েছে মুখচেনা-নোটন—
বন্ধ-দক্ষিণের দরজা-ঠেস-দেওয়া গেরুয়া-ব্রোকেড-মোড়া
তানপুরা—কোনো রাগ রাগিণীর প্রসূতি না
যন্ত্রিতায় ধ্রুব অনির্বচনীয় চুম্বক-মধুতা···

একতলা আমাদের। হাটআল্‌গা দরজায় টোকা: আসতে পারি?
আসুন আসুন—সপরিবার সানন্দ অভ্যর্থনা।
লক্ষ্মী-পায়ে এলো, বসলো ডিভানে। খিদে ছিলো, অনুরোধে
আনারস খইচুর-মোয়া তারিয়ে তারিয়ে খেতে-খেতে
আড়চোখে এ-ঘরের আসবাব বিত্তের খুঁটিয়ে জরিপ:
ঠাসা-বুকসেল্‌ফের গা-ঘেঁষে ঝুলছে ধাক্কাপাড়-
ধুতির চুনট আর বাড়তি-ঝুল গোলাপি ফিনলে,
দু'বিঘত নিচে বাঁকানো শুঁড়ের কোলাপুরি,
নাগালের ঈষৎ উঁচুতে স্তাঁদালের গোপন ডায়েরি
কাঁধে কাঁধে মিশে র‍্যাঁবোর 'নরকে এক ঋতু'
'মাতাল নৌকো'ও পাল তুলে সহাবস্থানে
আমাদের নীরদ সি. চৌধুরির 'কনটিনেনট অফ্ সার্সি'—
জরিপের যোগফল এক অতলান্ত বিহ্বল
নোটন, তানপুরা-প্রসঙ্গে শুনি গীতশ্রী গানেও।
অমনি সমস্বর অনুরোধ: তাহলে একটা গান।
আড়ষ্ট পারদ নামছে ধীরে-ধীরে
আল্‌জিভে ছোট্টো টুক্‌রো কাশি, ন'ড়েচ'ড়ে নিবিড় নিমগ্ন
উচ্চারণ: 'আমার পরান যাহা চায় তুমি তাই,
তুমি তাই গো।'···

সেবারের বসন্তউৎসব প্রমীলা-তারকার ভিড়ে ঠাসা—
ইন্দিরা নেহরু, তৃণা পুরোহিত, তিস্তা গুরুং, রাজেশ্বরী বাসুদেব,
গিনি-মোহরেরা অপলক তাকিয়েছে থ—মারকাটারি
কে বটেন ইনি। ঠায় হাঁটু মুড়ে বিনিঃশেষ অমৃত ঝরালে,
কলাবতি, জিতে নিলে গোটা সংগীতভবন শিল্পের সপ্তক
ছাতিম-মুকুট সমুজ্জ্বল দশ দেশিকোত্তম ;
নাতিবিন্দু আনন্দকুঙ্কুম-চর্চিত ললাট
রুদ্রপলাশের কলি নিজহাতে গুঁজলে খোঁপায়।
বুঝলাম, রবীন্দ্র-লিরিক-উৎসে বাহুবল্লরী অনিন্দ্য উপমা।

বিলক্ষণ কেউকেটা তুমি। নারীমুক্তি অগ্রনায়িকার
কেতা-কায়দায় আব্ছা আড়ালে ধূপ জ্বলে নেভে
—না-হলে অগ্নিকন্যা ক্লারা জেটকিন, না-ভগিনী নিবেদিতা!—
বোতামফুলের টবে সুখের ঋতুর কুঁড়ি ফোটে
আগুনরঙ কনটেসায় শিল্পপতি-গা-ঘেঁষা ইচ্ছুক যৌবন,
সন্ধ্যা-রাত্রি কুইন্‌স্‌ম্যানসনে ওঠা-নামা লিফ্‌ট ;
দূর-দূরবিনে ঝিলমের শিকারায় ডুপুর গড়ায়
ফ্রেম-ভাঙা-ছবি নিঃশঙ্কিনী আর-এক নোটন
পেস্তারঙ সালোয়ার কামিজ সব সুতো ছিঁড়ে ছুঁড়ে
প্রমত্ত ঝর্নার মুক্তি পহলগাঁও-র শৃঙ্গার শিলুএট ;
শরীরের কোষে-কোষে পেকে-ওঠা মৌরিগন্ধ মদির কুমেল
পেগ্-পেগ্ কড়া স্কচ ( হায়, ঠাণ্ডা হংকংওয়াটার জোটে নি )
গলা যেন শুকনো দুখী ভিস্তির মশক
চাপ দিলে ভোঁতা-সুর বুড়ি-বাঈজির ফ্যাঁস ফ্যাঁস,
বেমালিক-তানপুরা কিরকির দুরন্ত আঁধির ধুলো গেলে।

স্বরবৃত্তে একটানা লম্বা ছেদ,—
ধেড়ে-কাঠবিড়ালির ক্ষিপ্র দৌড় এ-ডাল ও-ডাল ফড়্‌কে-ডাল
ব্যাঙ্কক সাংহাই গা-ছমছম বার্সিলোনা-রাত্রির
সরখেল দাবাড়ুর ঘুঁটি অক্লান্ত মোক্ষম
ওড়াচ্ছে ওড়াক্ বুকের খোদল থেকে গোলা-পায়রার ঝাঁক ;
অমিতআমিষে অরুচি, ভিন্নমার্গ অন্ত্যপরিক্রমায়
ওরেগন্-এর সহজিয়া ধ্যানের আবহ
ভেক-ভগবান রজনীশ-আশ্রম ভোগ-সম্ভোগের





জম্পেশ ককটেল,—কে আগে কে পরে স্বত্বের দখলে
সুয়োরানী দুয়োরানী খটাখটি ঝুট-ঝামেলার
অবসান, তপোবনে লম্বা লালবাতি।

কলকাতার পুরনো অ্যাপার্টে পুনশ্চ স্বাগত
নোটন। যোগাশ্রম জমজমাট। ভন্‌ভন্ বিট্‌লে-বিট্‌লেনি
প্রহরে-প্রহরে নিধিশ্বাস-ব্যায়ামের ক্লাস—
হরিণ-চামড়ার জাজিম বিছিয়ে মাতাজি এখন
নিমগ্ন প্রাণায়াম সাবলীল কুম্ভক রেচক
'ওঁ মণিপদ্মে হুং…'।

নক্ষত্রমণ্ডল ছিঁড়ে-ছিটকে চক্রনেমি-ছোঁয়া
চিত্রা স্বাতী বিশাখার মৃত্যুতিথি মনে রেখে-রেখে
কে বা কা'রা তিলাঞ্জলি ঠেলে ছায় মরা কোটালের স্রোতে
পলি-জমা সমতলে পাকদণ্ডী আরোহ-অবরোহে
হাঁটুভাঙা শিরছেঁড়া যন্ত্রণার জ্বর নামে
স্বস্তির আশ্বাসে গান 'আজি দখিন-দুয়ার খোলা'…
ত্রস্ত ত্যক্ত ছিন্নভিন্ন ভালুকআঁধার
হিরণ্ময় অষ্টিষ্টের অভিজ্ঞান ব্রহ্মকমলিকা
ভাঙা ভৈরো ভোরের সিম্ফনি
কে বাজাবে আলোর কৃত্যক গেরুয়া-ব্রোকেডে-মোড়া তানপুরা
সুরঙ্গমা আঙুলের আলাপে আভোগে
কে মেলাবে কল্পান্তের শুদ্ধ গুণকেলি ?

## পেছন দিকে হাঁটা

কামাল হোসেন

ছোটো ঘরটা থেকে বেরিয়ে পিছিয়ে এলাম,
চোখের সামনে স্পষ্ট হল পুরোনো একতলা বাড়ির
হলুদ কঙ্কাল, আর একটু পিছিয়ে এসে
হঠাৎ আবিষ্কার করলাম বাড়িটার ছাদের কার্নিসে
দু-তিনটে ছোটো-ছোটো অশ্বত্থের চারা
আর ভাঙা জানলার সিল্যুয়েটে ক্ষীণ দৃশ্যমান
কেয়াবতী কিংবা কেতকী নামক কোনো রমণীর
টুকরো-টুকরো মুখশ্রী…

ক্রমাগত এক-পা এক-পা করে পিছু হাঁটছি,
চোখ আমার বাড়িটার দিকে, কিংবা বলা যায়,
বাড়িটার কঙ্কালের দিকে, তার অবশিষ্ট,
তার হা-ভাতে চেহারা, একপাশে পুরোনো বাঁজা
বকুলগাছ, বাড়িটার আত্মার মতো…

এভাবে সামনের দিকে চোখ মেলে রেখে
এক-পা এক-পা করে পেছন দিকে হাঁটা,
বড়ো বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলা, বিশেষ করে
পেছনে যদি থাকে একটি ব্যস্ত রাস্তা, আর তার
বুকের ওপর চলমান পরাবাস্তব দ্রুতগতির
সারি-সারি গাড়ি…





## কোথাও বৃষ্টি হয়ে ঝরে গেছে

অজিত মিশ্র

কোথাও বৃষ্টি হল : তাই এখানে তার হিমেল নিশ্বাস
গুমোট কেটে গিয়ে শিরশির করে উঠছে প্রহর
রুক্ষ বনভূমির বুকে তার ভেজা শালোয়ার…

কোথাও তুমি চোখ ফিরিয়েছ তাই
মনের মধ্যে ছায়া ফেলছে প্রশান্তির ডানা
কোথাও তুমি গুনগুন গান গেয়েছ তাই
আজ সবকিছুই বেজে উঠছে সুরের মতো…

কোথাও তুমি বৃষ্টি হয়ে ঝরে গেছ :
অন্ধকার গলিতে এখন তোমার ভিজে শরীরের ঘ্রাণ
জীবনের রুক্ষ বারান্দার রেলিংএ
ওই উড়ছে তোমার ভালোবাসার নীল রুমাল॥

# একদিন আমি দেখেছিলেম

পিনাকী ভাদুড়ী

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৭ সালে লিখেছিলেন "সে"। তখন তাঁর আয়ুর আর বড়ো বেশি বাকি নেই। প্রায় সব কাজ শেষ করে এনেছেন, সব কথা বলে নিচ্ছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের জীবনের কাজ শেষ হয় না, সমাপ্ত হয় না তাঁর কথা। আরো বাঁচলে তিনি নিশ্চয় আরো কিছু বলে যেতে পারতেন। তাঁর "সে" বইটির শেষ দিকের একটি অংশ আমাদের আলোচনার কাজে আসতে পারে। সত্যযুগে জন্মালে কে কী হতে চায়, এই নিয়ে যখন কথা চলছিল, তখন—

> সুকুমার···স্বপ্নে কথার বলার মতো বলে উঠল, আমার ইচ্ছে করে শালগাছ হয়ে দেখতে।···
> ও শালগাছ হতে চায় শুনে তুমি তো হেসে অস্থির।···
> আমি বললেম—দক্ষিণের হাওয়া দিল কোথা থেকে, গাছটার ডাল ছেয়ে গেল ফুলে···গাছ না হতে পারলে গাছের সেই অপরিমিত রোমাঞ্চ অনুভব করব কী করে।···
> তুমি কথা পাড়লে, আচ্ছা দাদামশায়, এখন যদি সত্যযুগ আসে তুমি কী হতে চাও।···
> আমি হতে চেয়েছিলুম একখানা দৃশ্য অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সকালবেলার প্রথম প্রহর, মাঘের শেষে হাওয়া হয়েছে উতলা। পুরোনো অশ্বত্থ-গাছটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ছেলেমানুষের মতো, নদীর জলে উঠেছে কলরব, উঁচুনিচু ডাঙায় ঝাপসা দেখাচ্ছে দলবাঁধা গাছ। সমস্তটার পিছনে খোলা আকাশ·· তোমার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল, একখানা গাছ হওয়ার চেয়ে নদী বন আকাশ নিয়ে একখানা সমগ্র ভূদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কল্পনা তোমার কাছে অনেক বেশি সৃষ্টিছাড়া বোধ হল।

এই উদ্ধৃতিটিতে দেখা যাবে কেমন করে ছবি হবার কল্পনাটা পরিণত হয়ে উঠছে। প্রথমে 'গাছ', পরে 'দৃশ্য'—দুটোরই পিছনে যে চিন্তাটা রয়েছে সেটা হল ছবি 'দেখা'।

ছবির কথা অবশ্য এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মুখে







নানা প্রসঙ্গে শোনা যাচ্ছে। এখন তিনি চিত্রকর হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছেন—বিশ্বের বিদগ্ধ-জনের সামনে তাঁর ছবির প্রদর্শনী স্বীকৃত হয়েছে কিছুদিন আগেই। কিন্তু লক্ষ করতে হবে, তিনি এই উদ্ধৃতিটিতে ছবি আঁকার কথা না বলে ছবি হওয়ার কথা বলছেন। ছবি না বানিয়ে, ছবি 'দেখতে' চাইছেন। মনে হয় এই জগতের মধ্যেই, আমাদের চারপাশে নিত্য-নিয়ত যে ছবি গড়ে উঠছে তার প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ঘনীভূত হচ্ছিল। এদিক থেকে ভাবলে দেখা যাবে ছবি দেখার কথা তিনি বারে-বারে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে বলছেন। শেষ বয়সে যখন জরা তাঁকে অধিকার করছে, গ্রাস করে নিচ্ছে তাঁর ইন্দ্রিয়ের শক্তি—যখন কানে ভালো শুনতে পাচ্ছেন না, দৃষ্টিও ম্লান হয়ে আসছে, তখন বিধাতার কাছে ন্যূনতম যা চাইছেন তা হল তাঁর দৃষ্টিশক্তি। বলছেন, চোখ যদি যায় তবে এই বিশ্বকে এমন করে কে দেখবে আর? 'দেখার দৃষ্টির' কথা ছিন্নপত্রেও বলেছেন। অর্থাৎ সারা জীবনই সৃষ্টিকে প্রধানত তিনি দেখতে চেয়েছেন।

এই 'দেখার' ইতিহাস তাঁর রচনায় কেমনভাবে ছড়িয়ে আছে, আমরা সেটি অনুধাবন করার চেষ্টা করব। সেইটি দেখলে তাঁর ছবি আঁকার কাজে চলে আসাটা আর হঠাৎ কিছু বলে মনে হবে না। সত্তর বছর বয়সে কবি প্রতিমা দেবীকে লিখছেন—'ছবি কোনোদিন আঁকিনি···হঠাৎ বছর দুই-তিনের মধ্যে হু-হু করে এঁকে ফেললুম আর এখানকার ওস্তাদেরা বাহবা দিলে।' কথাটা অংশত সত্য, কারণ ছবি আঁকার আগে ছবি দেখার পালা, কবি সে কাজটি ছেলেবেলা থেকেই করে আসছেন। সেই ছবি 'দেখার' তীব্রতা এত বেশি ছিল যে ছবি আঁকতে শুরু করে তাঁর মনে হচ্ছে ছবি আঁকাটাই তাঁর স্থায়ী কাজ, এতদিনের সাহিত্যসাধনাকে বলছেন বুদ্‌বুদ্ মাত্র।

পাকাপাকিভাবে শেষ বয়সে ছবি আঁকার আগে, রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির কাটাকুটিতে ছবি বানাবার চেষ্টা আছে। সেগুলো তাৎপর্য পেল যখন তিনি ছবি আঁকতেই নামলেন সরাসরি। কিন্তু ওই কাটাকুটি দেখলেও মনে হবে তিনি আপন মনে ছবি 'দেখতে' চাইছেন, চাইছেন কোনো 'দৃশ্য' হয়ে যেতে, যেমন "সে" গ্রন্থের সুকুমার চেয়েছিল। অল্প বয়সে চিঠিতে (ছিন্নপত্র) লিখেছেন—চিত্রবিদ্যার প্রতি তিনি হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকেন। চারদিকে তাকিয়ে জগতের ছবি দেখতে-দেখতে যদি এই হতাশা এসে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির অ্যালবাম যখন "চিত্রলিপি" নামে বেরোল, কখন তার ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন—The universe has its only language of gesture, it talks in the voice of pictures and dance.—বিশ্বের এই ছবির ভাষায় কথা বলার ব্যাপারটা কবিকে তাঁর নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে রেখেছিল হয়তো, তাই ছিন্নপত্রের চিঠিতে হতাশ প্রণয়ের কথা বলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন নিয়মিত ছবি আঁকছেন, তাঁর তখনকার রচনাতেও ছবি 'দেখার' কথা বলে চলেছেন। 'সুধীন্দ্র-নাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু', এই বলে যে কবিতা লিখেছেন তাতে বলছেন—

> পড়েছি আজ রেখার মায়ায়।
> কথা ধনী ঘরের মেয়ে,
> অর্থ আনে সঙ্গে করে,
> মুখরায় মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।

অতএব, কথা ছেড়ে রেখার দিকে ঝুঁকতে চাইছেন কবি। রেখার কথা বলতে গিয়ে তিনি যা বলছেন, তাতেও ওই 'দেখার' পরিচয় পাওয়া যাবে।

> গাছের শাখায় ফুল ফোটানো ফল ধরানো
> সে কাজে আছে দায়িত্ব;
> গাছের তলায় আলোছায়ার নাট-বসানো
> সে আর-এক কাণ্ড।
> সেইখানেই শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়ে,
> প্রজাপতি উড়তে থাকে,
> জোনাকি ঝিক্‌মিক্ করে রাতের বেলা।

এই যে বর্ণনাটি দিচ্ছেন এতে তিনি যা দেখছেন তারই ছবি। দেখেই মুগ্ধ হচ্ছেন, প্রকৃতির ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, 'সে আর-এক কাণ্ড'। এই কাণ্ড দেখেই ছবি আঁকতে গেছেন তিনি, যে কাজে 'দায়িত্ব' আছে, তার বদলে এই 'আলোছায়ার নাট-বসানো'ই তাঁকে টানছে।

"জীবনস্মৃতি"তেও নিজের বাল্যকালের স্মৃতিচারণ যখন করছেন, তখন তাঁর মনে পড়ছে যে ছেলেবেলায় কেমনভাবে ঘরের দেয়ালে ছবির কল্পনা করে নিতেন, 'দেখতেন' নতুন ছবি—

> দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ক্ষীণ আলোকে দেখিতাম, দেয়ালের উপর হইতে মাঝে-মাঝে চুনকাম খসিয়া গিয়া কালোয় সাদায় নানা প্রকারের রেখাপাত হইয়াছে, সেই রেখাগুলি হইতে আমি মনে-মনে বহুবিধ অদ্ভুত ছবি উদ্ভাবন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম।

দৃষ্টি চালনা করছেন শুধু তাই নয়, মস্তিষ্কও চালনা করছেন, তাই ওই ছবি-উদ্ভাবন। এমন কাজ অবশ্য অনেক শিশুই নিশ্চয় করে থাকে, কারণ এটা মানুষের স্বাভাবিক কল্পনাশক্তির অঙ্গ, তবে অনেকের বেলায় এই মনে-মনে খেলাটুকু ক্রমশ বন্ধ হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা হয় নি।

এই প্রসঙ্গে দেয়ালের 'ছবি দেখা' নিয়ে একটি বিখ্যাত গল্প আমাদের সকলেরই মনে পড়তে পারে। গল্পটি বাল্যকালে পড়েছিলাম, বোধহয় বুদ্ধদেব বসুর লেখা। মেসে থাকতেন এক ভদ্রলোক—একা, একটি ঘরে। একবার কী একটা ছুটিতে তিনি কয়েকদিনের জন্য কোথায় গেলেন। কোনোদিন কোথাও যান নি। ঘরটা ফাঁকা পেয়ে মেসের ম্যানেজার চুনকাম করার ব্যবস্থা করলেন। বহুদিন রঙ হয় নি—কতরকম দাগ হয়ে রয়েছে দেয়ালে। রঙ করা হল। কয়েক দিন বাদে ভদ্রলোক ফিরে এলেন। ঘরে ঢুকেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। এ কী হয়েছে ঘরের চেহারা। সব ধবধবে, তকতকে, কোথাও কোনো দাগ নেই। সবাই অবাক। ভদ্রলোক বললেন, তিনি কোথাও কখনো যেতেন না। এই ঘরের দেয়ালের গায়ে কত দাগ হয়েছে, রোদ্দুরে, বৃষ্টিতে, ধোঁয়ায়,—তাতেই তিনি নানা ছবি দেখতে পেতেন। কল্পনা করতেন কারো মুখ, কোনো নদী, কখনো পাহাড়। এখন তো সেসবের কোনো উপায় আর রইল না।

রবীন্দ্রনাথ 'দেখা' নাম দিয়েই যে কবিতা লিখেছেন "পুনশ্চ"তে, তাতে পরিষ্কার বলেছেন—

> মন বলে, এই আমার যত দেখার ঢুকরো
> চাই নে হারাতে।
> পিছনে রেখে যাব
> ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে,
> তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি—
> একদিন আমি দেখেছিলেম এই সব-কিছু।

এই 'দেখার স্মৃতি, দেখার আনন্দ' তাঁকে দিয়ে একদিন ছবি আঁকতে বসিয়েছে। কিন্তু তাঁর আঁকার কথা আমরা বলতে বসি নি। 'দেখার উল্লাস' তাঁর রচনায় কেমন চিহ্ন রেখে গেছে সেইটেই আমরা লক্ষ করছি। এই প্রসঙ্গে টমাস হার্ডির 'আফটারওয়ার্ডস' কবিতাটি মনে পড়ে। কবি যে প্রকৃতিকে দেখতে ভালোবাসতেন, সেই কথা তাঁর মৃত্যুর পরেও কেউ মনে করবে, এই কথাই বলেছেন হার্ডি—

> 'He was a man who used to notice such things', / 'He was one who had an eye for such mysteries'

—রবীন্দ্রনাথও এমন কথাই বলছেন তাঁর 'দেখা' কবিতায়।

অসিতকুমার হালদারের আঁকা সরস্বতীর ছবি দেখে লিখছেন—'তুমি যে সুরের আগুন ছড়িয়ে দিলে…'। 'ওই জানালার কাছে বসে আছে করতলে রাখি মাথা' —এটি একেবারে চিত্রধর্মী, কাউকে দেখে কি লিখেছিলেন? কারো আঁকা ছবি দেখে? ছবিটি কোনো রমণীর তাতে ভুল নেই, তবে উৎস পাওয়া যাচ্ছে না। 'একলা বসে হেরো তোমার ছবি'—এটিকেও যেতে পারত যে কাউকে ভেবে লিখেছেন, অথবা কাউকে মনে করে ছবি আঁকতে-আঁকতে সেই ছবিরই বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু আসলে তা নয়—সরাসরি কাউকে দেখে হয়তো লেখেন নি, তবে অনেককে দেখেও লিখে থাকতে পারেন।

চিত্ররচনার ভাষ্য হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আরো কবিতা পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। এগুলি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে আছে। এগুলি অবলম্বন করে কোন শিল্পী নিজের মতো করেও ছবি আঁকতে পারেন।

> বিপুল প্রস্তরপিণ্ডে ভূতত্বের কণ্ঠ রুদ্ধ করি
> ছিল যুগে যুগান্তরে নিরর্থক দিবাবিভাবরী —
> দীর্ঘ তপস্যার পরে ভাঙাইল প্রথম কুসুম
> ধরণীর বাণীছাড়া ঘুম।

এই কবিতাটি কলকাতার পাতাল রেলের রবীন্দ্রসদন স্টেশনের প্রবেশ-মুখে উৎকীর্ণ আছে।

আরো উদাহরণ :

> বিস্মৃত যুগে গুহাবাসীদের মন
> যে ছবি লিখিত ভিত্তির কোণে
> অবসরকালে বিনা প্রয়োজনে
> সেই ছবি আমি আপনার মনে
> করেছি অন্বেষণ।

আবার, ছবিকে কথায় গাঁথতে গিয়ে সংকুচিত হচ্ছেন তার সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে—

> হে চিত্রভারতী দেবী, ক্ষমা মোরে তোমার মহিমা
> যদি খর্ব করে থাকি, দিতে গিয়ে বাক্যে দেহা সীমা
> বাক্যের অতীত তুমি।…

এবারে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করছি, সেটি হয়তো কোন পোর্ট্রেটের সামনে বসে লেখা—

> তোমার মতো একা আমি, তোমার মতো একা
> অবাক চক্ষু অসীম শূন্যে কোন রহস্য দেখা।

রবীন্দ্রনাথ যেসব পাখির ছবি এঁকেছেন, সেরকম পাখি কেউ কখনো দেখেনি, এরকম শোনা যায়। কবি নিজেও ওই ধরনের কথাই বলছেন এই দু-লাইনের কবিতায়—এ পাখি দেখেছেন কবি একাই, তাঁর দেখার ধরনটা এক্ষেত্রে আলাদাই ছিল—

> যে রূপকথার পক্ষী তুমি রেখায় তাহার বাসা
> লুকিয়ে ছিলে স্বপ্নে আমার নাই কোনো তার ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মতো করেই প্রকৃতিতে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ছবি 'দেখতে' পেতেন। যেমন লিখছেন—'এই জনশূন্য সমুদ্র ও আকাশের সঙ্গমস্থলে পশ্চিম দিগন্তে একখানি ছবি দেখলুম। অল্প কয়েকটি রেখা, অল্প কিছু উপকরণ…যা দেখলুম তাকে বিশেষ অর্থেই ছবি বলছি, যাকে দৃশ্য বলে, এ তা নয়।… একে সম্পূর্ণ করে দেখবার জন্য এত বড় আকাশ এবং এত গভীর স্তব্ধতার দরকার ছিল।'

"চিত্রবিচিত্র" নামে কবির যে বইটি আছে সেটির দুটি ভাগ—চিত্র এবং বিচিত্র। দুটিতেই বিচিত্র চিত্রাজি পাওয়া যাবে।

> কুমোরপাড়ার গোরুর গাড়ি
> বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি
> গাড়ি চালায় বংশীবদন
> সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন।
> হাট বসেছে শুক্রবারে
> বকশিগঞ্জে পদ্মাপারে।
> জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে
> গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।
> উচ্ছে বেগুন পটল মুলো
> বেতের বোনা ধামা কুলো
> সর্ষে ছোলা ময়দা আটা
> শীতের ব্যাপার নক্‌শা কাটা।

পরিষ্কার একটি ছবি। যেমন দেখছেন, তেমনি লিখেছেন। এটি পড়েই এঁকে ফেলা যায়—তৈরি করা যায় চিত্রনাট্য।

> দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম্‌ডিম রবে
> সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে,

অথবা

> মাথার থেকে ধানিরঙের ওড়নাখানা সরে যায়
> চীনের টবে হাস্‌নুহানার গন্ধে বাতাস ভরে যায়—

কিংবা

> দোকান বাজার ওঠে নামে যেন ঝড়ের তরী
> চৌরঙ্গীর মাঠখানা ওই যাচ্ছে সরি সরি—

—সবই মনে হবে ছবি 'দেখে' লিখছেন। আর তাই তো লিখছেন। সত্যিই তো, সাঁওতালপাড়ার উৎসব তো কতবার দেখেছেন, দেখেছেন পথচলতি রমণীর ঘোমটা খসে গেছে। এইসঙ্গে ভেবে নিয়েছেন শহুরের পথঘাট চলতে শুরু করলে কেমন হয়। যা দেখছেন, কিছুই হারাচ্ছে না। এসব আঁকবেন আরো পরে, ততদিনে লিখে-লিখে ধরে রাখছেন সব ছবি। তবে ঐ ছবি আঁকা নিয়ে কৌতুকও কম করেন নি। একটি চিঠিতে লিখছেন—'যত পেন্সিল চালাচ্ছি, তার চেয়ে বেশি রবার চালাচ্ছি।' কবিতায় লিখছেন—

> পেন্সিল টেনেছিনু সপ্তাহ সাতদিন
> রবার ঘষেছি শেষে তিনমাস রাতদিন।
> কাগজ হয়েছে সাদা ; সংশোধনের বাধা
> ঘুচে গেছে, এইবার শিক্ষক হাত দিন—
> কিন্তু ছবির কোণে স্বাক্ষর বাদ দিন।

মাস্টারমশাই ঐঁকে দেবেন পুরোটা, তবে নামসই থাকবে কবির—মজাটা একটাই।

লিওনার্দ দ্য ভিনচি তাঁর "মহাপ্লাবন" ছবিটা আঁকবার আগে খসড়াটা নোট করে নিয়েছিলেন। সেটি ছিল এই রকম—

> শিলামিশ্রিত চিরন্তন বৃষ্টির স্থতোয় গাঁথা বিরোধী ঝড়গুলোকে চাপা অন্ধকারের উপরে স্তাঁপিয়ে পড়তে দাও।···দুরন্ত স্রোতের ধর্ষণে পাহাড়ের চাঁইগুলো ভেঙে পড়ে উপত্যকার কাদার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। নদীরা ফেঁপে, ফুলে, ফোঁস ফোঁস করে ডাঙার বাসিন্দাদের সহ সব ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ···পর্বতচূড়ায় ভীত, সন্ত্রস্ত এবং ক্রমত অত্যন্ত নিরীহ হয়ে যাওয়া জন্তুরা মানুষের সঙ্গে একত্রে পাশাপাশি বাস করছে। জমি, খেত, খামারের উপর দিয়ে যে জলরাশির আদিগন্ত তরঙ্গ যাচ্ছে, সেই তরঙ্গগুলোর মাথায় ভাসছে টেবিল, খাট নৌকা বিছানা, মানুষ ইত্যাদি আর তাদের উপরে আঁকড়ে বসে আছে মৃত্যুভয়ে জর্জরিত মানুষ।···একদল লোক সড়কি বল্লম হাতে করে হিংস্র জন্তুদের কাছ থেকে সেই স্থানটি রক্ষা করছে···এক দারুণ সন্ত্রাস বিরাজমান।

১৯৩০ সালে জার্মানিতে ফিল্ম কোম্পানির অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ *The Child* নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। এটি আসলে একটি চিত্রনাট্য, যদিও এতে শট ডিভিশন করা ছিল না, কারণ ওই ব্যাপারটা কবি জানতেন না। তবে জেনে রাখা চলে যে এই কবিতার মুদ্রিত রূপের সঙ্গে কবি কয়েকটি ছবি এঁকে দিয়েছিলেন যেগুলিতে শট কেমন হবে তা প্রকাশ করা হয়েছিল। লিওনার্দ দ্য ভিনচির "মহাপ্লাবন" ছবির খসড়া যেমন ছিল, এই *Child*-এও সেইরকম 'খসড়া দৃষ্টি' পাওয়া যায়।

> 'What of the night?' they ask. / No answer comes. / For the blind Time gropes in a maze and knows not its path or purpose. / The darkness in the valley stares like the dead eyesockets of a giant. / The clouds like a nightmare oppress the sky...

এই কবিতাকেই পরে কবি বাঙলায় "শিশুতীর্থ" নামে লেখেন—সেখানেও এই খসড়া-দৃষ্টি বর্তমান। দুটোই দীর্ঘ কবিতা, দুটোই চিত্রসম্ভারে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির এবং মানুষের ছবি—শিশু বা *Child*-এর জন্মের চিত্রেই কবিতা দুটি শেষ হয়—

> Victory to the Man, the new-born, the ever living / জয় হোক মানুষের, ঐ নবজাতকের, ঐ চির-জীবিতের।

রবীন্দ্রনাথ যেসব শিল্পীদের নিয়ে গল্প লিখছেন—তাদের মধ্যে 'দেখার' বিদ্যাস নিয়েই বানিয়ে তুলছেন উপাখ্যান। 'চিত্রকর' গল্পে বালক চুনিলাল নৌকো-ভাসানোর যে ছবি আঁকে তা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তবু, 'চলল রচনা, আকাশের চিত্রীও যা-খুশি তাই করেছেন, আর ঘরের মধ্যে এই মস্ত চোখ-মেলা ছেলেটিও তথৈবচ।' অর্থাৎ এখানেও শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিটাই রবীন্দ্রনাথ বড়ো করতে চেয়েছেন। সেইটাই ভবিষ্যতে শিল্পীর স্বকীয়তা হয়ে উঠবে।







'ভুলস্বর্গ' রচনাটিতে যে বেকার শিল্পীকে ভুল করে কাজের স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে স্বর্গের ব্যস্ত মেয়ের হাত থেকে জল আনার ঘড়াটি চেয়ে নিয়েছিল। তাতে সে ছবি আঁকবে। ব্যস্ত মেয়ে বিরক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত দিয়েছিল সেই ঘড়া। শিল্পী তার গায়ে আঁকল কত রঙের পাক, কত রেখার ঘের। কিন্তু মেয়েটি সে ছবি কিছু বুঝতে পারল না। কারণ তার তো ওই শিল্পীর মতো দেখার দৃষ্টি নেই। সে বললে—'এর মানে?' শিল্পী বলল—'এর কোনো মানে নেই।' মানে না থাকলেও এই ছবির দিকে তাকিয়ে মেয়েটির ঘুম চলে গেল। শিল্পীর এই ছবি 'আবেদন' কবিতার মালাকরের মতো—'অকাজের কাজ যত···শত শত আনন্দের আয়োজন।'

এই 'দেখার' নতুনত্বই হল ছবির বিশেষত্ব। এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা লেখায় নানাভাবে বলেছেন। গান গেয়েছেন মাঠের দিকে তাকিয়ে—'রোদের দিনে ছায়ায় বসে বাজায় বাঁশি রাখাল যত'—জাহাজে বসে সূর্যাস্ত দেখে লিখেছেন—'ভালো লাগার শেষ যে না পাই', পরে একে রূপান্তরিত করেছেন গানে—'মধুর তোমার শেষ যে না পাই।'

দেখার এই মাধুর্যের কোনোদিন শেষ পাননি রবীন্দ্রনাথ। জীবনের প্রান্তে এসে এই দেখার আনন্দের কথাই বার-বার বলেছেন। চোখ দিয়ে যা দেখেছেন তার মধ্যে অসীম রহস্য তাঁকে বারে-বারে পুলকিত করেছে। 'দেখা' তাই তাঁর কাছে শুধুমাত্র দৃষ্টিপাত ছিল না, ছিল তাঁর সত্তার উজ্জীবন। 'দেখা' তাঁর কাছে নতুন অনুভূতি সৃষ্টি করত। "বীথিকা" কাব্যের 'মাটিতে-আলোতে' কবিতায় বলছেন—

> ···তাই প্রিয়মুখে
> চক্ষু যে পরশটুকু পায়, তার দুখে সুখে
> লাগে সুধা, লাগে সুর,
> তার মাঝে সে রহস্য সুমধুর
> অনুভব করি—
> যাহা সুগভীর আছে ভবি
> কচি ধানখেতে ;
> রিক্ত প্রান্তরের শেষে অরণ্যের নীলিম সংকেতে ;
> আমলকীপল্লবের পেলব উল্লাসে,
> মঞ্জরিত কাশে ;···
> হে প্রেয়সী, এ জীবনে
> তোমারে হেরিয়াছিনু যে নয়নে
> সে নহে কেবলমাত্র দেখার ইন্দ্রিয়
> সেখানে জেলেছে দীপ বিশ্বের অন্তরতম প্রিয়।
> আঁখিতারা সুন্দরের পরশমণির মায়া-ভরা
> দৃষ্টি মোর সে তো সৃষ্টি-করা।···

এই গ্রন্থেরই আরেকটি কবিতায় বলছেন—

> যা পেয়েছিনু অসীম এই ভবে
> ফেলিয়া যেতে হবে—
> আকাশ-ভরা রঙের লীলাখেলা,
> বাতাস-ভরা সুর,
> পৃথিবী-ভরা কত-না রূপ, কত রসের মেলা
> হৃদয়-ভরা স্বপন মায়াপুর,
> মূল্য শোধ করিতে পারে তার
> এমন উপহার
> যাবার বেলা দিতে পারো তো দিয়ো
> যে আছ মোর প্রিয়।

পৃথিবীর যে রূপ দেখেছেন কবি, তার মূল্য যে অপরিশোধ্য একথাই প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিচ্ছেন এখানে।

"পত্রপুট" কাব্যে দুনম্বর কবিতায় বলেছেন যে যদি দেখার দৃষ্টি থাকে তবে অনেক সহজ হয়ে যায় মানুষের দুর্লভ সৌভাগ্য। আমাদের চারিদিকে যা ছড়িয়ে আছে, যা হয়ে ওঠে, তা নজরে পড়ে না বলেই আমাদের ঘরে-ঘরে হাজার লোকের মন 'হাঁপিয়ে উঠল।'

> ···আমার আঙিনার ধারে ধারে এতদিন চলেছিল
> এক-সার জুঁই-বেলের ফোটা-ঝরার ছন্দ,
> সংকেত এল, তারা সরে পড়ল নেপথ্যে ;
> শিউলি এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে,
> এখনো বিদায় মিলল না মালতীর।

কাশের বনে লুটিয়ে পড়েছে শুক্লাসপ্তমীর জ্যোৎস্না—
পূজার পার্বণে চাঁদের নূতন উত্তরী
বর্ষাজলে ধোপ-দেওয়া।

আজ নিশ্বরচায় হাওয়া-বদল জলে স্থলে
খরিদদারের দল তাকে এড়িয়ে চলে গেল
দোকানে বাজারে।
বিধাতার দামী দান থাকে লুকোনো
বিনা দামের প্রশ্রয়ে,
সুলভ ঘোমটায় নীচে থাকে
দুর্লভের পরিচয়।
বাঁশি বাজল।
আমার দুই চক্ষু যোগ দিল
কয়খানা হালকা মেঘের দলে।…

কবির 'দুই চক্ষু' যোগ দিয়েছে প্রকৃতির দৃশ্য-সম্ভারে। সেখানেই তিনি দুর্লভকে পেয়ে যাচ্ছেন—হাওয়া বদলের দায় তাঁর নেই, কারণ তাঁর প্রাঙ্গণেই রয়েছে সেই বদলের ইতিবৃত্ত। এই চেয়ে-চেয়ে দেখার আনন্দের কথা বলেছেন "সেঁজুতি"র 'যাবার মুখে' কবিতায়—

এই যে শিমুল, ওই যে শজিনা, আমারে বেঁধেছে ঋণে
কত-যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে
কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে…

এই 'চেয়ে থাকা'র পাগলামিই তাঁকে পেয়ে বসেছিল সারাটা জীবন। তাঁর ভালো লেগেছিল এইটাই—ওই কাব্যের 'জন্মদিন' কবিতায় বলছেন—

…ও দেখেছে গ্রামের বাঁকা বাটে
কাঁধে কলস মুখর মেয়ে চলে স্নানের ঘাটে ;
সর্ষে-তিসির খেতে
দুইরঙা সুর মিলেছিল অবাক আকাশেতে ;
তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অন্তরবির রাগে—
বলেছিল, এই তো ভালো লাগে।
সেই-যে ভালোলাগাটি তার থাক সে রেখে পিছে
কীর্তি যা সে গেঁথেছিল হয় যদি হোক মিছে ;
না যদি রয় নাই রহিল নাম,
এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম।

'কীর্তি' নয়, দেখার বিস্ময়কেই কবি রেখে যেতে চান। সেই বিস্ময়বোধ থেকেই হয়তো তিনি হাতে তুলি ধরেছিলেন, তবে সে তো অন্য কাহিনী। আসল কথা হল তাঁর দৃষ্টির সজীবতা। তাঁর মৃত্যুর বছরে লেখা একটি চিঠিতে তিনি নিজের বাল্যকালকে স্মরণ করেছেন এইভাবে—গায়ে একখানা মাত্র জামা দিয়ে গরম লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতুম। …নারকেল গাছের কম্পমান পাতায় আলো পড়বে, শিশিরবিন্দু ঝলমল করে উঠবে, পাছে আমার এই দৈনিক দেখার ব্যাঘাত হয় এইজন্য আমার ছিল এমন তাড়া।' এই যে দৃশ্যটি বর্ণনা করলেন কবি চিঠির এই অংশে, এটি ছিল তাঁর 'দৈনিক দেখা'। অল্প বয়স থেকেই দেখার জন্য এই আকুলতা, দৃষ্টির বিহ্বলতা তাঁকে স্বতন্ত্র করে তুলতে পেরেছিল। এই দেখার একটি অভিঘাত তাঁকে দিয়ে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়ে নিয়েছিল, সেকথা আমাদের মনে পড়তে পারে। সেও একটি সূর্যোদয়ের মুহূর্ত ছিল, যে সময়ে কবি ছড়িয়ে-পড়া সূর্যের আলোর সামনে দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন।

শেষ বয়সে যখন নিজের জীবনকে পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ "আত্মপরিচয়" লিখলেন, তখনো বললেন—'আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাইনি।'

এখানেও সেই বিস্ময়ের কথা বলছেন, বলছেন ক্লান্তিহীন নেত্রপাতের আনন্দের কথা। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ইতিহাস তাঁর বিস্ময়দৃষ্টির কাহিনী।


**সহায়ক গ্রন্থ**

রবীন্দ্রচিত্রকলা : রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমি—সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ক্ষণিকের বাণীশিল্পী রবীন্দ্রনাথ—অরুণকুমার বসু।
গানের লীলার সেই কিনারে—সুধীর চক্রবর্তী।
ফিল্ম সেন্স—আইজেনস্টাইন।




# স্মৃতির শিলালিপি

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

এক

চাঁদিপুরে যাবার কোনো তাগিদ নীতির ছিল না। মনোজের পীড়াপীড়িতে তাকে রাজি হতে হল। দু বছর বিয়ে হবার পর,—দুজনে,—স্রেফ দুজনে,—কোথাও বেড়াতে যাওয়া এই প্রথম।

নতুন বউ হয়ে এ বাড়িতে আসার আগেই নীতির ধারণা হয়ে গিয়েছিল, এই সংসারে তাকে কী-কী দায়িত্ব নিতে হবে। মনোজের মামা, যিনি এই বিয়ের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, নীতিকে দেখতে যাবার দিন তাকে মোটামুটি আভাস দিয়েছিলেন সবকিছুর। সেদিন মনোজ ছিল না। বিয়ের আগে সে নীতিকে দেখতেই আসে নি। মামার সঙ্গে ছিল মনোজের অবিবাহিত একমাত্র বোন এবং তার অফিসের এক বন্ধু। প্লেট থেকে একটা সিঙাড়া তুলে নিয়ে তাতে অর্ধেক কামড় দিয়ে মামা বলেছিলেন—'সবই তো শুনলাম। …মেয়ে যে ঘরসংসারের কাজ নিয়েই দিন-রাত ব্যস্ত থাকে, এটা শুনে ভালোই লাগছে। নতুন সংসারে ওর অসুবিধে হবার কথা নয়।' তারপর সিঙাড়াটা চিবোবার জন্যে একটু থেমে আবার বলেছিলেন নীতির দিকে তাকিয়ে—'দেখো মা, যে বাড়িতে তুমি বউ হয়ে যেতে চলেছ, সেই বাড়ির ভেতরকার ছবিটাও তোমার কিছুটা আগে থেকে জানা দরকার। তাহলে তুমি নিজের মনকেও তৈরি করে নিতে পারবে।'

ছবিটার যে ধারণা ভদ্রলোক দিয়েছিলেন সেদিন, তা নীতির অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে গেছে। এই সংসারে লোক বলতে মাত্র তিনজন। মনোজ, তার বিধবা মা আর বোন রত্না। বর্তমানে নীতিকে ধরে লোকসংখ্যা চার। বলতেই হবে ছোটো সংসার। কিন্তু এই ছোটো সংসারেও অনেক কাজ। শাশুড়ি একেবারে শয্যাশায়ী। নীতি এ বাড়িতে আসার অনেক আগে থেকেই তাঁর এই অবস্থা। সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে পা ভেঙেছিলেন। ডাক্তার ভেঙে-যাওয়া

হাড় জোড়া লাগিয়ে দিলেও, পায়ের শক্তি ফিরিয়ে দিতে পারে নি। আগেকার মতো উঠে-হেঁটে তিনি বেড়াতে পারেন না। সারাদিন শুয়েই থাকেন। বই পড়েন। রত্না রাঁধতে জানে না। শেখার কোনো চেষ্টাই করে নি বোধহয় কোনোদিন। মা শয্যাশায়ী হওয়ার পর একজন রাঁধুনি জুটিয়েছিল মনোজ। নীতি আসার পর তার চাকরি গেছে। এখন নীতির প্রাত্যহিক রুটিনটা এরকম : সকাল সাতটার মধ্যে স্নান সেরে রান্নাঘরে ঢোকা। চা এবং জলখাবারের ব্যবস্থা করা। সেটা চুকে যাবার পর নিজের হাতে কুটনো কেটে রান্না। এরই মাঝে ঘড়ি দেখে শাশুড়িকে ওষুধ খাওয়ানো। দুপুরবেলা তেমন বিশ্রামেরই বা সুযোগ কোথায়? বাড়ি তো শুনশান। মনোজ অফিসে। রত্না কলেজে। বিছানায় শাশুড়ির নাক ডাকে। আর নীতি রান্নাঘরে একা-একা বসে রাতের খাওয়াদাওয়ার রান্নাটা সেরে রাখে। কেননা সন্ধে-বেলায় রান্না করতে তার মোটেই ভালো লাগে না। সাতটা নাগাদ মনোজ অফিস থেকে ফিরেই কোনো-রকমে কিছু মুখে দিয়ে ক্লাবে তাস খেলতে বেরিয়ে যায়। অতঃপর টিভি খুলে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া নীতির আর-কিছু করার থাকে না। এই দু বছরের বিবাহিত জীবনে তারা কবার বেড়াতে বেরিয়েছে আর কটা সিনেমা দেখেছে, এটা তো নীতি হাত গুনে বলে দিতে পারে। আবার ঠিক স্বামী-স্ত্রী দুজনে একসঙ্গে গেছে বললেও ভুল বলা হবে। অনিবার্যভাবে রত্নাও তাদের সঙ্গে গিয়েছিল। একদিন নীতি মৃদু গলায় প্রতিবাদ জানিয়েছিল : 'আমরা দুজনে একসঙ্গে কোথাও বেরোতে পারি না? সবসময়েই কি রত্নাকে নিয়ে যেতে হবে?'

'কেন? রত্না গেলে কি তোমার অসুবিধে হয়?'

'অসুবিধে হবে কেন? ···তবে বিয়ের পর থেকে দুজনে একসঙ্গে তো কোথাও যাই নি। ···সবাই তো যায়। তা ছাড়া···'

'তা ছাড়া কী?' তীব্র চোখে তাকিয়েছিল মনোজ।

'রত্না বাড়িতে থাকলে মায়েরও তো একটু সুবিধে হয়। রোজ-রোজ পাশের বাড়ির নিভা-বউদিকে বলতে হয় না মাকে পাহারা দেবার জন্যে—।'

'সেক্ষেত্রে শুধু আমাদের সিনেমা দেখাই হবে। রত্নার হবে না। ওরও তো দেখতে ইচ্ছে করে—।'

'কেন? রত্না তো কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা যেতে পারে। হয়তো যায়ও—।'

'অত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে? না যেতেও পারে। আমাকে না বলে ও কোথাও যায় না।'

'বন্ধুদের সঙ্গে একটু-আধটু সিনেমায় যাওয়া অপরাধ নয়।'

এভাবে তর্ক হয়তো অনেকদূর গড়াত। কিন্তু হঠাৎ মনোজ সেই তীব্র কথাটা উচ্চারণ করেছিল। ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি টেনে বলেছিল—'আসলে ব্যাপারটা কী জান? রত্নাকে তুমি সহ্যই করতে পার না।'···

সেজন্যেই কয়েকদিন পর, একদিন সন্ধেবেলা অফিসথেকে ফিরে চা খেতে-খেতেমনোজ যখন বলল—'বিয়ের পর তো কোথাও আমাদের বেড়াতে যাওয়া হয় নি। চলো—দু-তিন দিনের জন্যে কোথাও ঘুরে আসি।' —তখন নীতি যারপরনাই অবাক হয়ে গেল।

'কী ব্যাপার? হঠাৎ?'

'ব্যাপার কিছু না। অফিস থেকে একটা জরুরি কাজে বাইরে যাবার সুযোগ পাচ্ছি।'

'ও—তাই বলো। কিন্তু অফিসের কাজ আর বউকে নিয়ে বেড়ানো কি একসঙ্গে হয় নাকি!'

নীতির গলায় ঝাঁঝ থাকলেও মনোজ সেটা গায়ে মাখল না।

'আরে বাবা! হবে হবে। কাজ তো ঘোড়ার ডিম। একটা অফিসে আমাদের অফিসের কিছু চিঠিপত্র পৌঁছে দেওয়া। জরুরি চিঠিপত্র। ব্যস! তারপরেই আমি ফ্রি! অফিসেরও কাজ হল। টি. এ. পেলাম। আর বেড়ানোও হল। আমার সব খরচ অফিসই দেবে। আর তোমারটা দেব আমি।'

'শুধু আমার খরচ কেন? রত্নাও তো যাবে!'





'নাহ। রত্নাকে আর সঙ্গে নেব না। ওর সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা। তা ছাড়া মাকে কয়েকদিন দেখাশোনা করারও ব্যাপার আছে। নিভা-বউদি রান্নায় একটু সাহায্য করলে রত্না মাকে নিয়ে ঠিকই থাকতে পারবে।'

একটু থেমে, চায়ের কাপটা শেষ করে, মনোজ নীতির দিকে তাকিয়ে হাসে।

একবার চোখ টিপে বলে : 'প্রতিদিন একই ঘর···একই বিছানা···ভালো লাগে নাকি?···একটা ভালো হোটেলে উঠব···গদিতে মোড়া নরম বিছানা ···ঘরে ডিম লাইট জ্বলবে···খুব আদর করব তোমাকে ···খুব!' আবেগে মনোজ নীতিকে কাছে টেনে নিতে যায়।

কিন্তু নীতি ধরা না দিয়ে ছিটকে সরে যায়।

—'ভর সন্ধেবেলা অসভ্যতা! রত্না পাশের ঘরে পড়াশোনা করছে। যদি হঠাৎ ঢুকে পড়ে?'

মনোজ দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসে। হাসতে-হাসতেই নীতিকে ফস করে একটা চুমু খেয়ে বলে—'সমুদ্রে দুজনে খুব চান করব? কী বল?'

'সমুদ্র? জায়গাটা কোথায়?'

'চাঁদিপুর।'

'চাঁদিপুর?' নীতি যেন একটা চমক খায়।'

'কেন? তুমি গিয়েছ নাকি?'

'ন্-না। ···ওখানকার সমুদ্র নাকি মোটেই ভালো নয়? তার থেকে পুরী কিংবা দীঘাতে গেলে বোধহয় অনেক ভালো হত।'

'এখন সুযোগ যখন এসেছে, চাঁদিপুরই চলো। পরে না হয় ওইসব জায়গায় যাওয়া যাবে।'

নীতি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। 'আসছি' বলে মনোজ ক্লাবে বেরিয়ে যায়। নীতি ভাবতে থাকে। ভাবতেই থাকে। হঠাৎ এই আশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটল কেন?—যে তাকে মনোজের সঙ্গে চাঁদিপুর যেতে হবে। চাঁদিপুর···! নামটা শোনার পর থেকেই তার স্মৃতি যেন একটা ধাক্কা খেল। অনেকদিন আগে সন্তর্পণে, গোপনে গুটিয়ে-রাখা সুতো যেন আবার খুলতে শুরু করল ···।'

## দুই

কথাটা মনোজকে বলবে কি বলবে না, এটা নিয়ে নীতি অনেক ভাবল। বিয়ের আগে চাঁদিপুরে গিয়েছিল সে। আজ থেকে অনেক বছর আগে। কত বছর আগে? মনে-মনে হিসেব করল। তা প্রায় দশ বছর হবে। নীতি তখন কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। চাঁদিপুর থেকে বেড়িয়ে ফিরে আসার পরই সেই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটেছিল! সৌরভ···। নীতির দাদার বন্ধু সৌরভ। প্রেসিডেন্সি কলেজের থার্ড ইয়ারের উজ্জ্বল ছাত্র। নামের সঙ্গে স্বভাবের এত অদ্ভুত মিল সচরাচর দেখা যায় না। দাদার সঙ্গে কোনো কারণে সে এলেই সারা বাড়িতে যেন একটা খুশির সৌরভ ছড়িয়ে পড়ত। এসেই হৈ-চৈ শুরু করে দিত :

'মাসিমা, আজ আমাকে পোস্তর বড়া খাওয়াতে হবে। গরম, গরম। বেশিক্ষণ সময় দিতে পারব না, মাসিমা। সন্ধেবেলা একটা জায়গায় যেতে হবে।'

মা হেসে বলতেন—'আচ্ছা। আচ্ছা। হবেখন সবকিছু। এখন স্থির হয়ে একটু বসো তো। সবসময় যেন পায়ে চাকা লাগানো আছে।'

হয়তো নীতি ঘরে বসে একমনে পড়াশোনা করছে। ঘরে ঢুকে সৌরভ বলত—'অত গম্ভীর মুখে কী পড়াশোনা করছ, নীতি? ইস্কুলের দিদিমণি হিসেবে তোমাকে যা মানাবে না!'

এ ধরনের কথায় নীতি অত্যন্ত রেগে যেত। বই-পত্র মুড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত দুমদুম করে। আর তাই দেখে সৌরভ হেসে গড়িয়ে পড়ত—'এই রে—দিদিমণি রেগে গেছে।' সবাই হাসত সৌরভের সঙ্গে। মা, বাবা, দাদা—সবাই। তারপর সৌরভ যখন আবার নীতির কাছে গিয়ে বলত—'রাগ ভাঙাতে গেলে কি ঘুষ দিতে হবে, দিদিমণি?' তখন নীতিও হাসি চাপতে

পারত না। হাসতে-হাসতে ঘাড় নাড়ত—'কিছু না। কিছু না।'

'কিন্তু আমি যে তোমার পছন্দের জিনিস এনেছি।' পকেট থেকে চকোলেটের পাত বের করত সৌরভ।

'চকলেট দিয়ে ভোলাচ্ছ? আমাকে বাচ্চা মেয়ে পেয়েছ নাকি?'

'তুমি তো চকলেট খেতে ভালোবাস।'

'কী করে জানলে?'

'সেদিন যে আমার সামনে তোমার দাদাকে আনতে বললে।'

'উঃ! ···তুমি না? ···সত্যি?'

'নাও ধরো।' চকোলেটের পাতটা জোর করে গুঁজে দিতে গিয়ে সৌরভের আঙুল নীতির হাতের নরমে হঠাৎই আঁচড় কেটেছিল। আর মুহূর্তের জন্যে শরীর কীরকম শিউরে উঠেছিল নীতির?·····

একবার ঠিক হল, বাড়ির সবাই মিলে চাঁদিপুর যাওয়া হবে। এবং সৌরভও যাবে। নীতি কাউকে বলে নি। কিন্তু সৌরভ যাবে শুনে তার মনে খুব আনন্দ হয়েছিল। যাবার সময় ট্যুরিস্ট বাসে—হাসির কথা বলে, গান গেয়ে, মাউথ অর্গ্যান বাজিয়ে সবাইকে যেন মাতিয়ে রেখেছিল সৌরভ। বাবা কিংবা মা,—দুজনের মুখেই শুধু এক কথা—সৌরভ না এলে বেড়ানোটা মোটেই জমত না। চাঁদিপুরে পৌঁছে সারাদিন সমুদ্রের ধারে ঘোরাঘুরি করে সন্ধেবেলা সবাই যখন হোটেলের ঘরে গোল হয়ে গল্প করতে বসেছে, সৌরভ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নীতিকে ডেকেছিল। উঠে এসেছিল নীতি।

'কী বলছ, সৌরভদা?'

'বেড়াতে এসে কেউ ঘরে বসে গল্প করে নাকি? চলো—সমুদ্রের ধারে একটু ঘুরে আসি।'

'এই অন্ধকারে সমুদ্রের ধারে? মা বকবে, সৌরভদা।'

'কিছু বকবে না। আচ্ছা, আমি বলছি। মাসিমা —আমরা একটু বেরোচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছ—বাবা?'

'এই একটু আসছি।'

'বেশি দূরে যেয়ো না। একটু পরেই রাতের খাবার দেবে।'

'ঠিক আছে। কোনো ভয় নেই, মাসিমা।'

দুজনে সমুদ্রের দিকে হেঁটে গিয়েছিল সেদিন।

* * *

বালাসোরে নেমে প্রথমেই একটা অফিসে ঢুকল মনোজ। এই অফিসেই নাকি তার কাজ। রিসেপশনিস্টকে অপেক্ষা করতে বলে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আধ-ঘণ্টা পরেই মনোজ ফিরে এল। অফিসের বাইরে বেরিয়ে এসে, ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল মনোজ—'ব্যস! এবার আমি একেবারে ফ্রি। কাজটা যে এত তাড়াতাড়ি আর এত সহজে হয়ে যাবে বুঝতে পারি নি। অফিসারের হাতে চিঠিগুলো দিতে উনি সঙ্গে-সঙ্গে ডিকটেশন দিয়ে আমার এম. ডি.-কে একটা উত্তরও দিয়ে দিলেন। একেবারে সলিড কাজ। এবার মনের সুখে বেড়াব।'

'এখানে কোথাও চা পাওয়া যায় না? সকালে তো সেই একবার চা খাওয়া হয়েছে।' নীতি অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইল।

'এত বেলায় চা খাবে?' রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল মনোজ।

'সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। তার থেকে কোনো হোটেলে ভাত খেয়ে নেওয়া যাক। একটা নাগাদ চাঁদিপুরে যাবার একটা বাস এখান থেকে ছাড়ে। ওই বাসটাই ধরব।'

এই শহরে হোটেল তেমন ভালো নেই। অন্তত এ অঞ্চলে পাওয়া গেল না। একটা সাদামাটা হোটেলে খাওয়ার পালা চুকিয়ে তারা চাঁদিপুরের বাস ধরল। বিকেল নাগাদ পৌঁছে, খানিক ঘোরাঘুরি করে যে হোটেলটাতে তারা জায়গা পেল, নীতি ঠিক বুঝতে পারল না—দশ বছর আগে তারা এই হোটেলটাতেই উঠেছিল কিনা। বিকেলে দুজনে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেল। প্রথমবার এসে নীতির এই সমুদ্র ভালো লাগে নি। এবারও লাগল না। শুধু নিস্তরঙ্গ জলের অবাধ বিস্তার। যেন কোনো উচ্ছ্বাস নেই। আনন্দ নেই। উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো সমুদ্র শুয়ে আছে। কে তাকে দেখল, কে তাকে দেখল না,—এসব নিয়ে যেন তার কোনো মাথাব্যথা নেই। মনোজের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতেই দশ বছরের পুরোনো স্মৃতি যেন একটা কৌটোর ঢাকনা খুলে বেরিয়ে আসতে লাগল হু-হু করে। মাত্র দুটো দিনে যা-যা ঘটেছিল যেন ছায়াপুঞ্জের মতো দৃশ্যমান নীতির চোখের সামনে। ভীষণভাবে মনে পড়ছে সৌঃভের কথাগুলো। কোনো দিন কাউকে বলা হয় নি সেসব কথা। মনোজকেও বলতে পারবে না। মনোজ তাকে নিশ্চিত ভুল বুঝবে। তার স্মৃতিকে কোনো মূল্যই দেবে না। বরং সৌরভকে নিয়ে সময়ে-অসময়ে খোঁটা দেবে। নতুন করে এক অশান্তি শুরু হবে তাদের জীবনে। না,—মনোজকে কোনো কথাই বলা ঠিক হবে না। চাঁদিপুরে যে এসেছিল, এটা সে গোপনই রাখবে।

'কী অত ভাবছ?' মনোজ জিজ্ঞেস করে।

'কী আর ভাবব? দেখছি···।'

'বিয়ের পর এই প্রথম দুজনে বাইরে আসা। বেশ ভালো লাগছে। তাই না?'

'হ্যাঁ···।' একটা চিলকে আর-একটা চিল তাড়া করেছে। হয়তো খেলা করছে ওরা নিজেদের মধ্যে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে নীতি একটু জোর দিয়েই বলল—'আমার তো বেশ ভালো লাগছে।'

মনোজ নীতির দিকে তাকিয়ে বলে—'তোমার যে অনেক ক্ষোভ আছে তা আমি বুঝি, নীতি। কিন্তু কী করব বলো? সব সংসারের প্যাটার্ন তো আর একরকম নয়। রত্নার বিয়ের জন্যে খোঁজখবর চালাচ্ছি। তাড়াতাড়ি একটা কিছু হয়তো হয়েও যাবে। ওর বিয়েটা হয়ে গেলে আমরা একেবারে ফ্রি। প্রয়োজনমতো মায়ের জন্য একটা ভালো নার্সের ব্যবস্থা করে আমরা মাঝে-মধ্যে এদিক-সেদিক বেড়াতে পারব।'

'ছিঃ,—আমাকে তুমি এত ছোটো ভাব?'

'নাহ্-না। এমনি বলছি।'

'এ ধরনের কথা আমার একেবারেই ভালো লাগছে না।' গম্ভীরভাবে নীতি বলে।

ক্রমে সন্ধে নামে। হোটেলে ফিরে আসে ওরা। চায়ের পর কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসে থাকার পর মনোজ বলে—'সিগারেট কিনতে একবার বাইরে যেতে হবে।'

'তুমি যাও। আমি বারান্দায় বসে আছি।'

'বসে থাকবে কেন? গড়িয়ে নাও একটু। সারাদিন যা ধকল গেছে!'

'নাহ্, একটু বসেই থাকি।' নীতি বলে।

'সে তোমার যা সুবিধে। কিন্তু রাতে বিছানায় শুয়েই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না।' চোখ ছোটো করে মনোজ হাসে।

'যাহ্, অসভ্য।' মনোজ বেরিয়ে যায়। আর নীতি ভাবতে বসে·····।

## তিন

সেদিন চাঁদ ছিল না আকাশে। শুধু মেঘ আর মেঘের পরত। হাওয়া বইছিল ঠাণ্ডা। আর মাঝে-মাঝে আকাশের বুক চিরে চকিতে বিদ্যুতের ঝিলিক। ঘন অন্ধকারে সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বালির মধ্যে আন্দাজে পা ফেলতে হচ্ছে। সৌরভ বেশ লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে ঠিক তাল রাখতে পারছিল না নীতি। হঠাৎ ভীষণ রাগ হয়ে গেল তার। হাঁটা থামিয়ে চেঁচিয়ে বলল—'সৌরভদা, একটু দাঁড়াও—।'

'কী হল? নীতি?'

'এই অন্ধকারে হাঁটা যায় নাকি? যেভাবে তুমি যাচ্ছ, মনে হচ্ছে—আমি পেছনে আছি ভুলে গেছ।'

'সরি, ভেরি সরি। আমার কাছে টর্চ আছে।

খেয়াল ছিল না।' পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল সে।'

'চলো নীতি। এবার আর অসুবিধে হবে না। আসলে আমি একটা ব্যাপার চিন্তা করছিলাম।'

'অত যদি চিন্তা করবে তো আমায় নিয়ে বেরোলে কেন? বিছানায় শুয়ে থাকলেই পারতে।'

'রাগ কোরো না, নীতি। এখানে তোমাকে ডেকে এনেছি—কারণ—কারণ—'

'কারণ কী?'

সৌরভ চুপ করে থাকে।

'বলো, কী কারণ? এমনিই চলে এলাম আমি। —কোনো কারণ আছে জানলে এভাবে আসতাম না।'

'তোমার কোনো ভয় নেই, নীতি। কারণটা অন্যরকম কিছু নয়। এই নির্জন সমুদ্রের ধারে, গোপনে, —আমি তোমাকে আমার জীবনের কয়েকটা কথা জানাতে চাই।'

'জীবনের কথা?'

'হ্যাঁ। যা বলছি—ধৈর্য ধরে শোনো। তার আগে এসো এখানেই বসি।' টর্চ জ্বেলে জায়গাটা দেখে নেয় সৌরভ। তারপর বালির ওপর বসে। নীতিও বসে। একটু দূরত্ব রেখে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে সৌরভ বলতে শুরু করে—'আমি তোমার দাদার বন্ধু। একসঙ্গে কলেজে পড়ি। এ ছাড়া আমার বিষয়ে তুমি আর কিছু কি জান?'

এরকম এক প্রশ্নে একটু যেন থমকায় নীতি। কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলে—'প্রশ্নটা ঠিক বুঝলাম না।'

'আমার সম্বন্ধে তোমার দাদা আর কিছু বলে নি?'

'না—তো?'

'তাহলে আমিই বলছি। কেন বলছি জানি না। কয়েকদিন ধরে আমার মনে হয়েছে এই কথাগুলো কাউকে বলা দরকার। তাই তোমাকেই বলছি।'

আবার থামে সৌরভ। যেন কিছু ভেবে নেয়। অন্ধকারে তার সিগারেটের আগুন শুধু জ্বলছে। হাওয়ায় বেশ জোর। নীতি শাড়ির আঁচলটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিল। অস্পষ্টভাবে সমুদ্রের শব্দ কানে আসছিল।

'আমি এক রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, নীতি। এই মুহূর্তে পুলিশের চোখে আমি একজন উগ্রপন্থী। অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম আমরা। এমন একটা দেশ গড়তে হবে—যেখানে জাতপাত থাকবে না, শোষণ থাকবে না, কোনোরকম সামাজিক বৈষম্য থাকবে না। হয়তো ঠিকই ভেবেছিলাম আমরা। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে মাঝপথে সব যেন গণ্ডগোল হয়ে গেল। বিপ্লব করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই খতমের রাজনীতি শুরু করে দিলাম আমরা। এখন আমাদের সংগঠন বিচ্ছিন্ন। অনেক নেতাকেই পুলিশ খুঁজছে। কিভাবে এগোব বুঝতে পারছি না আমরা···! আর এদিকে—!' হাতের নিভে-যাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় সৌরভ। তারপর গলা নীচু করে বলে—'তোমার কাছে স্বীকার করছি, নীতি—আমি একটা খুনের আসামী!'

'সৌরভদা!' নিজের অজান্তেই নীতি চিৎকার করে উঠেছিল।

'চুপ। চেঁচিয়ো না।···আমার দলের ছেলেরা ছাড়া কেউ একথা জানে না। খুনটা করার পর একটা অপরাধবোধ কাজ করছে। তোমাকে সেটা বলে হালকা হতে চাই।···মাস ছয়েক আগে এক পুলিশ অফিসারকে খুনের ব্যাপারে আমি ছিলাম। তিন-জন ছিলাম আমরা···। লোকটা—সাব-ইনসপেকটর। আমাদের দলের কয়েকজনকে ধরার পেছনে ওর হাত ছিল।···একদিন রাতে ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরছিল। প্রায় ওর বাড়ির সামনেই ওকে আমরা চপার দিয়ে কুপিয়ে-কুপিয়ে মারি। মাথায় মোক্ষম আঘাতটা আমিই করেছিলাম, নীতি! উঃ! কী রক্ত!···রক্তও ছিল লোকটার শরীরে! রক্ত ফিনকিতে বেরিয়ে এসে





আমার জামায় লেগেছিল!···'

'সৌরভদা!'

'হ্যাঁ, নীতি। তোমার পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত। তাই না? যে, আমার হাতে মানুষের রক্ত লেগে আছে? ব্যাপারটা নিয়ে পরে অনেক ভেবেছি আমি। কেন আমি এই খুনটা করেছিলাম? এটা করে বিপ্লবকে কতটা এগিয়ে দিতে পেরেছিলাম আমি? খুন করার বেশ কিছুদিন বাদে আমি ওই পুলিশ-অফিসারের বাড়ির খোঁজ নিয়েছিলাম। একটা পাঁচ বছরের ছেলে আছে ওদের। অসহায় বউটা ছেলেটাকে নিয়ে একেবারে পথে বসেছে। তার জন্যে দায়ী তো আমরাই। তাই নয় কি? মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করতে এসে আমরা একটা সংসারকে ভাসিয়ে দিলাম। এরকমভাবে কত সংসারকেই আমরা ভাসিয়ে দিয়েছি। কে তার হিসেব রাখে? ···এসব প্রশ্ন আমি রেখে-ছিলাম আমার সংগঠনের গোপন সভায়। জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, হত্যা এবং ধ্বংসের মধ্য দিয়ে কোন্ নতুন সমাজ আমরা গড়তে চাইছি? সবাই চুপ করতে বলেছিল আমাকে। এবং আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। এসব ছাড়াও আরো একটা বিপদ হয়ে গেছে।'

'কী বিপদ, সৌরভদা? বলো—বলতেই হবে।' নিজের অজান্তেই কখন নীতি একটা হাতে আলতো করে সৌরভের হাত ছোঁয়।

'চুপ! আস্তে কথা বলো। কেউ শুনে ফেলতে পারে। ওই খুনটার ব্যাপারে আমরা তিনজন জড়িত ছিলাম। দুজনকে পুলিশ ধরেছে। লক-আপে পুলিশের অত্যাচারে এদের মধ্যে কেউ একজন আমার নামও বোধহয় ফাঁস করে দিয়েছে। আমাকেও পুলিশ খুঁজছে। তোমাদের সঙ্গে হঠাৎ এভাবে চাঁদিপুর চলে আসার পেছনে কারণ আছে। কয়েকদিনের জন্যে আমি গা-ঢাকা দিতে চেয়েছি।'

'কিন্তু কলকাতায় ফিরলে তো তোমাকে ধরা পড়তেই হবে?'

'তা নাও হতে পারে। কলকাতায় ফিরে আমি একদিন থাকব। তারপরই বোম্বে পালিয়ে যাব। ওখানে আমার এক আত্মীয় আছে। সব ব্যবস্থা করা আছে।'

'তার মানে, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।' নীতি এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সৌরভ কিছু না বলে নীতির পিঠে শুধু একটা হাত রাখে। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না নীতি। নিজের মুখ সৌরভের বুকে গুঁজে দিয়ে সে কাঁদতে থাকে··· কাঁদতেই থাকে। আর অস্ফুটে বলে—'তোমাকে আমি ভালোবাসি—সৌরভদা, ভালোবাসি?···'

'আমি জানি। জানি বলেই তো···। এত কেঁদো না, নীতি। তাহলে আমি দুর্বল হয়ে যাব। বম্বেতে এখন কয়েকমাস গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। তারপর যদি কলকাতা শান্ত হয় কোনোদিন, আমি আবার এসে তোমাকে···।'

সেদিন রাতে হোটেলে ফিরে মায়ের পাশে শুয়ে নীতি দু-চোখের পাতা এক করতে পারে নি। শুধু ভেবেছিল···আর ভেবেছিল···। কী হবে সৌরভদার? কী হবে?

চাঁদিপুর থেকে সেবার ওরা ফিরে আসার কয়েক-দিন পরেই অবশ্য সৌরভের খবর পাওয়া গেল। খবরটা নিয়ে এল নীতির দাদাই। একদিন দুপুরে কলেজ থেকে হাঁফাতে-হাঁফাতে বাড়ি ফিরে দাদা চেঁচিয়ে মাকে ডাকল। নীতিও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে-ছিল। ঢকঢক করে একগ্লাস জল খেয়ে দাদা জানাল —'সৌরভ মারা গেছে। বরানগরে একটা রাস্তার ধারে ওর ডেড-বডি পাওয়া গেছে? শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে গুলিতে।' ···বাকিটা আর শুনতে পারে নি নীতি। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়েছিল···।

চার

সকালবেলা হোটেলে ব্রেকফাস্ট সেরে মনোজ প্রস্তাব

দিল—'চলো পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের মন্দিরটা ঘুরে আসি। জায়গাটা নাকি বেশ দর্শনীয়। কলকাতা থেকে একটা ট্যুরিস্ট বাস এসেছে। সেই বাসটা যাচ্ছে ওই জায়গায়। এখান থেকে আমাদের ছুটো সীট হয়ে যাবে। ওই একই বাসে আমরাও বিকেলে কলকাতা ফিরে যাব।'

নীতি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অল্প প্রসাধন সারছিল। কোনো উত্তর দিল না। খাটে বসে মনোজ সিগারেট খাচ্ছিল আর একমনে লক্ষ করছিল তার বউকে। নীতির ঘন, কালো চুলের ঢল তার কোমর ছাড়িয়ে নেমে গেছে।

'কী? উত্তর দিলে না?'

'কী উত্তর দেব?'

'যাবে না? পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের মন্দিরে?'

'যাব না কেন? তুমি নিয়ে গেলেই যাব। বেড়াতে এসে আবার অত জিজ্ঞেস করে নাকি কেউ? যা-যা দেখার জিনিস দেখতে হয়।'

'বাহ্! তুমি যা জ্ঞান দিতে পার না? স্কুলের দিদিমণি হলে তোমাকে মানাত ভালো।' মনোজ হাসে।

'সে সুযোগ থাকলে তো ভালোই হত। এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে তোমাকে একটু সাহায্য করতে পারতাম।'

'তা বলছ কেন? চাকরি না করলে কি আর হেল্প করা যায় না? নিজের হাতে, এত শ্রম দিয়ে তুমি আমাদের সংসারকে সাজিয়ে রেখেছ।'

কথাটা শুনে নীতির ভালো লাগে। এটা যে সে মনোজের মুখে প্রথম শুনল তা নয়। এই একটা গুণ মনোজের আছে। সংসারে নীতির অবদানকে সে সুযোগ পেলেই স্বীকার করে। কিন্তু···, কিন্তু নীতির মন আবার ভার হয়ে গেল। স্মৃতির বেদনা তাকে যেন আজ ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়বে। পঞ্চলিঙ্গেশ্বর-মন্দিরের প্রসঙ্গ উঠতেই তার আবার মনে পড়ে গেল দশ বছর আগের সেই ছুটি দিনের কথা! সেবার এখানে বেড়াতে এসে ওই জায়গাতেও তারা গিয়েছিল। বাসেই গিয়েছিল সকলে। যেতে-যেতে সে সৌরভকে লক্ষ করছিল আর অবাক হচ্ছিল। গত সন্ধেবেলা—সমুদ্রের ধারে দেখা চিন্তাপীড়িত সেই সৌরভের সঙ্গে দিনের আলোর এই সৌরভের যেন কোনো মিল নেই। চলন্ত বাসের জানলার ধারে বসে সে এখন মাউথ-অর্গ্যানে সুর তুলেছে। নীতির দাদা এবং অন্যান্যরা তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। কে বলবে—পুলিশের চোখ এড়িয়ে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে সৌরভ! মন্দিরে পৌঁছে সৌরভের উৎসাহে পাহাড়ে উঠেছিল নীতি। সেই পাহাড়েই একটা পাথরের গায়ে সৌরভ হঠাৎ···! এটা মনে পড়ায় নীতির খুবই উত্তেজনা হল! আজও সে ওই পাহাড়েই যাচ্ছে! সে দেখতে চায় এখনও সেই পাথরের গায়ে সেই চিহ্ন আছে কিনা! মা, বাবা ও অন্যদের পেছনে ফেলে সৌরভ নীতিকে নিয়ে তরতর করে উঠে এসেছিল অনেক ওপরে। একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়েছিল তারা। এবড়োখেবড়ো পাথরের পাঁচিল খাড়া উঠে গেছে! সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সৌরভ হঠাৎ একটা কাণ্ড করেছিল। পকেট থেকে একটা চকখড়ি বের করে পাথরের গায়ে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখেছিল—সৌরভ+নীতি।

'এটা কী ধরনের ছেলেমানুষি হল, সৌরভদা?'

মৃদু হেসে বলেছিল নীতি।

'ছেলেমানুষি নয়। পাথরের গায়ে লিখে গেলাম আমাদের নাম। এই লেখা কোনোদিন মুছবে না!'

'তা কি সম্ভব?' আবেগকম্পিত গলায় বলেছিল নীতি।—'কতদিন আর থাকবে এই লেখা? বৃষ্টিতে একদিন ধুয়ে যাবে।'

'না। যে পাথরে লিখলাম তার ওপরে দেখছ না,—আর-একটা পাথর কিরকম অনেকটা বেরিয়ে এসে আড়াল করেছে? বৃষ্টির ছাট কোনোদিনই ছুঁতে পারবে না ওই জায়গা। আমাদের দুজনের নাম এই পাথরের গায়ে খোদাই করা থাকবে বছরের পর







বছর·· অনন্তকাল···যতদিন এই পাহাড় এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে···!'

এতদিন পরে সত্যিই কি পাথরের গায়ে সেই ছুটি নাম আজও রয়ে গেছে? জানতে খুব ইচ্ছে করে নীতির। দেখতে সাধ জাগে···!

ট্যুরিস্ট বাস ছেড়ে দেবার খানিক পরেই ঘুম-কাতুরে মনোজ সীটে বসে ঢুলতে লাগল। আর নীতি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তার ভেতরে একটা অস্থিরতা শুরু হয়ে গেছে। এক মুহূর্তও যেন তর সইছে না। এক ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে পৌঁছে গেল তারা। জায়গাটা সত্যিই চেয়ে দেখবার মতো। পাঁচটি পাহাড়ের পাশাপাশি অবস্থান। তাই এরকম নাম। শিবের একটা মন্দিরও আছে। পালিশ-করা, ঝকঝকে নীল আকাশের তলায় নিখুঁতভাবে সাজানো এই পাহাড়ের সারি যেন দক্ষ ভাস্করের হাতে গড়া এক অনুপম ভাস্কর্য। বাস থেমে গেলে যাত্রীরা সব নামতে লাগল হুড়োহুড়ি করে। নীতি মনোজকে ঠেলা দিল—'এসে গেছি। নামতে হবে।' ঠোঁটের একপাশ বেয়ে গড়িয়ে আসা নাল হাতের চেটোয় মুছে মনোজ বলল—'চলো।' নেমে চারধার দেখে মনোজের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—'বাঃ! অপূর্ব!'

'সবাই ওপরে উঠছে। আমরাও উঠব।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'তাহলে আমি এগোচ্ছি। তুমি আস্তে-আস্তে এস।'

'কেন? একসঙ্গে উঠলে ক্ষতি কী?' মনোজ হেসে জিজ্ঞেস করে।

'তোমার ওই ভুড়ি নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে পারবে না। আমি খানিকটা ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে থাকব। তোমায় রিসিভ করব,' লঘু গলায় নীতি বলে।

'বেশ। বেশ।' হেসে মনোজ সায় দেয়।

ক্ষিপ্র পায়ে একটার পর একটা পাথর লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে থাকে নীতি। খানিকটা উঠতেই কল-কল শব্দ। মনে পড়েছে। পাহাড়ের গা দিয়ে একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। সৌরভ বলেছিল—'একটু কান পেতে শোনো, নীতি। যেন—কে সেতার বাজাচ্ছে!' এই জায়গা থেকে আরো কিছুটা উঠতে হবে। তার-পর·····ডানদিকে বাঁক নিলেই একটা চাতাল। সেখানে পাথরের দেয়ালে অজস্র নাম লেখা আছে। সব ট্যুরিস্টদের খেয়াল। দেয়ালে ছুটো নাম খুঁজতে থাকে নীতি। পাওয়া কি সম্ভব? কত বছর কেটে গেছে। কত ট্যুরিস্ট এই পাহাড়ে তাদের পদার্পণের আঁচড় রেখে গেছে। সেখান থেকে শুধুমাত্র ছুটি নাম কী করে খুঁজবে সে? ···তন্ন-তন্ন করে দেয়ালে চোখ বুলোতে থাকে নীতি। আর তার বুকের মধ্যে সহস্র দামামা বাজতে থাকে। খুঁজতে···খুঁজতে···খুঁজতে ···খুঁজতে···এই তো? পেয়েছে সে। নাম ছুটো দেখতে পেয়েছে। দশ বছর আগে যেমন একজন লিখে গিয়েছিল, ঠিক সেরকমই পাথরের বুকে জেগে আছে!—সৌরভ+নীতি।

তাহলে সৌরভের কথাই সত্যি। ···'আমাদের দুজনের নাম এই পাথরের গায়ে খোদাই করা থাকবে বছরের পর বছর···অনন্তকাল···যতদিন এই পাহাড় এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে···!' এক পরম বেদনার আনন্দে নীতির মন ভরে যায়।···

—'হাই নীতি।' মনোজ পেছনে থেকে ডাক দেয়। নীতি দ্রুত পেছন ফেরে। —'চলো।'

—'কী হল? নেমে যাচ্ছ? আর ওপরে উঠবে না?'

—'নাহ। আর উঠতে পারছি না। হাঁফ ধরেছে।'

—'সে কী? আমাকে যে ভুঁড়ি নিয়ে এত বললে? এখনও অনেকটা উঠতে পারি আমি—।'

—'না, থাক। চলো।

—নীতি—তোমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে কেন? কাঁদছ নাকি?'

—'ওমা, কাঁদব কেন?' তাড়াতাড়ি সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে-মুছতে বলে—'আসলে দমকা হাওয়ায় চোখে বোধহয় ধুলোবালি ঢুকে গেছে। কিরকম কিরকির করছে। তাই···'

মনোজকে আর-কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নীতি তরতর করে পাহাড় থেকে নামতে থাকে।

# রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সুভাষচন্দ্রের তিনটি পত্র

১

ট্রেন, ১৮/১১/৩৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সুধাকান্তবাবুর নিকট শুনিলাম যে আপনার ইচ্ছা আমি কলিকাতায় শ্রীনিকেতনের প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন করি। আপনার ইচ্ছা আমার নিকট আদেশের তুল্য। তাই প্রোগ্রাম বদলাইয়া আমি ডিসেমবরের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় ফিরিব। ৫ই ডিসেমবর প্রদর্শনীর উদ্‌ঘাটন হইলে আমার অসুবিধা হইবে না।

অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছা একবার আপনার ওখানে যাই। ব্যক্তিগত কারণ ছাড়া, সভাপতি হিসাবে আপনার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য অর্পণ করা আমার কর্তব্য। সে কর্তব্য এখনও সম্পন্ন হয় নাই। তাই মনের মধ্যে গ্লানিবোধ রহিয়াছে। আশা করি জানুয়ারী মাসে একবার আপনার ওখানে যাইতে পারিব।

আরও একটি কারণে আপনার নিকট যাইতে ইচ্ছা করি। বহুবৎসর পরে একটি স্বপ্ন সফল হইতে চলিয়াছে। আমরা এতদিন পরে নিজস্ব "কংগ্রেস ভবন" নির্মাণ করিতে চাই—কলিকাতায়। আশা করি—ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ "কংগ্রেস ভবন" হইবে। এই ভবনের ভিত্তিস্থাপন আপনার হাতে হইলে আমরা ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিব। জানি না আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে এ ভার বহন করা সম্ভব হইবে কি না।

আমি এখন লক্ষ্ণৌর পথে। ট্রেনে লিখিতেছি তাই লেখার এই অবস্থা। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি
বিনয়াবনত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন

২

৩৮/২ এল্‌গিন্ রোড,
কলিকাতা,
১৪/২/৪০

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমি পরশু রাত্রে বিহার অঞ্চলে সফর করে কলকাতায় ফিরি। তারপর কাল বন্ধু ও সহকর্মীদের সহিত দেখা হয় এবং এখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত হই। আসন্ন মালিকান্দা সম্মেলন ও গান্ধীজির বাঙলায় আগমন নিয়ে বাঙলার সর্বসাধারণ বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমি





গান্ধীজিকে পত্র দেওয়া সমীচীন মনে করি। গতকাল 'নাগপুর প্যাসেঞ্জারে' আমি লোকমারফত তাঁকে এই পত্র পাঠাই। আগামীকাল প্রাতে তিনি পত্র পাইবেন। এই পত্রের নকল আমি শ্রীযুক্ত সতীশ দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়দের পাঠিয়ে দিয়েছি। আজ গান্ধীজিকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছি যে আমি জরুরি চিঠি তাঁকে পাঠিয়েছি এবং চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি যেন শেষ সিদ্ধান্ত না করেন। আপনার অবগতির জন্য পত্রের নকল পাঠাইলাম।

আপনার ওখানে যাওয়ার বিশেষ ইচ্ছা ছিল—কিন্তু গান্ধীজি ওখানে আসছেন, ঠিক তার পূর্বে গেলে, লোকে ভুল বুঝিতে পারে—একথা ভেবে আপাতত ওখানে যাওয়ার প্রস্তাব স্থগিত রাখলাম। আজ শুধু একটা কথা বলে রাখি। Working Committee-র সঙ্গে বাঙলার ঝগড়া নিয়ে অনেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না—গোড়ার কথাটা কি, যা নিয়ে ঝগড়া। আজ আমাদের একটা ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠান (Forward Bloc) গড়ে উঠেছে। Working Committee-র সহিত বিরোধ সব জায়গায় দেখা দিয়েছে—তবে বাঙলায় বেশী, কারণ বাঙলায় আমাদের জোর বেশী। এ ঝগড়া প্রকৃতপক্ষে বাঙলার সঙ্গে নয়—ঝগড়া প্রকৃত-পক্ষে Forward Bloc ও বামপন্থীদের সহিত। বাঙলায় যারা তাঁদের 'ধামাধরা'—তাঁদের সহিত তো Working Committee-র কোনও ঝগড়া নেই। এ ঝগড়া প্রকৃতপক্ষে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের মধ্যে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে গান্ধীবাদী আজ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতীকস্বরূপ। নিতান্ত দুঃখের সহিত একথা বলছি—কিন্তু একথা একেবারে সত্য—এর মধ্যে অত্যুক্তি আদৌ নেই। সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ করে আমি এই কথা বলছি। তাই আজ গান্ধীজি, জহরলাল প্রভৃতি সকলে মিলেও আমার গতিরোধ করতে পারছেন না। যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে সম্প্রতি সফর করে আসছি। সেখানে সর্বসাধারণের যেরূপ আশাতীত উদ্দীপনা ও জাগরণ দেখে এসেছি—সকল স্থানে লোকে হাজারে-হাজারে যেরূপভাবে সাড়া দিয়েছে—তা চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না। মোট কথা—১৯২০/২১ খ্রীষ্টাব্দে যেরূপ পুরাতন নেতৃত্ব liquidated হ'ল এবং নূতন শক্তি কংগ্রেসে প্রবেশ করল, আজ ঠিক সেই অবস্থা। তফাত শুধু এই যে সুরেন ব্যানার্জীর স্থান গান্ধীজি নিয়েছেন।

এসব কথা সাক্ষাতে বিস্তৃত ভাবে আপনার কাছে নিবেদন করব। আজ আসি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি

বিনীত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

পুনঃ—বাঙলার ঝগড়া সেইদিন মিটবে যেদিন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি liquidated হবে।

সুভাষ

মালিকান্দা ঢাকা জেলার একটি গ্রাম। এই গ্রামে গান্ধীবাদী খাদি-কর্মীদের একটি কর্মকেন্দ্র ছিল।

URGENT.

38/2, Elgin Road,
Calcutta,
13th February, 1940

My dear Mahatmaji,

I was away from Bengal for about two weeks at a stretch and returned only last night after a whirlwind tour in Bihar. On my return, I have been informed of the situation that has arisen in Bengal in connection with your visit to this province and to the Malikanda Conference. I do not know if either the Poet or the organisers of the Malikanda Conference have kept you well posted with these developments. I am told that meetings protesting against your visit have been held at Malikanda itself and in the adjoining villages. I have not been able to get this information verified by Dr. Prafulla Ghosh yet. But there is no doubt that after the final decision of the Working Committee regarding the Ad Hoc Committee, public discontent and resentment have reached a climax.

I expect that this "mass-passion" or 'mass hysteria' will gradually sober down and that even if the fight with the Working Committee continues in future, it will be conducted in a much calmer atmosphere. Time is a powerful healing factor, as you know better than I do, from your larger experience of men and things.

I wonder how the organisers of the Malikanda Conference have overlooked the tense feeling which prevails in Bengal and have gone full steam ahead with their preparations.

I hold the view that every man and every party should have an opportunity of putting a particular point of view or a particular programme before the public without let or hindrance. Consequently, your visit to Bengal and the visit of those who have implicit faith in your programme and leadership should be welcomed. The public should have the opportunity of hearing you and them and of drawing their own conclusions thereafter.

Unfortunately, the general public are in such a frame of mind that I fear that you may not get the hearing that you should get, in view of all that you have done for the salvation of our dear motherland. After some time "mass passion" will surely sober down and then you all will get the proper atmosphere for fulfilling your mission.

You know better than I do that "mass passion", while it lasts, baffles sober argument and cool reason, but it cannot and should not be ignored simply because it is unreasonable. It is because it is sometimes inclined to be unreasonable that it becomes so difficult to control or restrain it. In the present heated atmosphere it is not altogether unlikely that there may be unwelcome demonstrations. If any such thing happens or if there is any direct or indirect insult aimed at any of eminent guests at Malikanda by excited or excitable people, it will give me the severest pain. I shall regard it as a calamity in view of my own code of hospitality laws. But how can I prevent it? I feel helpless in the present



atmosphere. If I felt that I could control the public, who are so agitated at the present moment, I would certainly have done so and would not have written this letter. It is becauee I feel so helpless that I am taking the liberty of writing to request you to postpone the Malikanda Conference and your visit to Bengal in connection therewith till the atmosphere cools down to some extent. Then when you do visit Bengal, my services will be at your disposal. And if you so desire, I may accompany you as a volunteer and see to it—so far as it lies in my power—that the public have the fullest opportunity of hearing you and your programme and deciding things for themselves after they have heard you.

I am writing this after a great deal of hesitation. Several friends have advised me not to write, on the ground that I may be misunderstood. But in my public life I have not been frightened by the fear of being misunderstood. I am sure you will not misunderstand me. Whatever our differences may be, my personal regard and devotion for you remains undimmed – and apart from major questions of principle etc.—you can always commandeer my services in any matter. Above all, I want that Bengal should adhere to her traditions of hospitality.

At the time of the Calcutta A. I. C. C. meeting I had voluntarily undertaken the responsibility of controlling and restraining the public. I could have succeeded in the fullest degree, but for an unexpected emotional outburst following my unexpected resignation. Even then we did succeed to a large extent. At the present moment, the situation here is unfortunately beyond my control.

There is a rumour also to the effect that some people want to bring you and other leaders to Bengal in the present atmosphere quite knowingly—hoping that if there is any unwelcome demonstration it will react against those who will participate in such demonstration and therefore help your orthodox followers in Bengal. I hope this rumour is without foundation. Your personality is too sacred to be used as an instrument in political warfare and it is difficult for me to conceive of any Congressmen thinking along these lines.

I have unburdend myself to you without any mental reservation whatsoever and I earnestly hope that you will find it possible to postpone the Malikanda Conference and your visit to Bengal in connection therewith so long as the present heated atmosphere prevails.

If and when you visit Bengal in future, you can commandeer my humble services in any capacity—so long as I do not have to act against my principles or political convictions.

With deepest regrads,

Yours affly.,
Sd. SUBHAS

৬

৩৮/২ এল্‌গিন রোড
কলিকাতা
১৬/২/৪০

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু

আপনার অবগতির জন্য আমি নিম্নলিখিত টেলিগ্রামের নকল আপনার নিকট পাঠাইতেছি :—

১। মহাত্মাজীর টেলিগ্রাম ওয়ার্ধা হইতে

২। আমার উত্তর

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনীত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

Wardhagung 15/2/40

Subhaschandra Bose
Elgin Road
Calcutta

Your wire letter stop Sorry cant postpone visit stop Postponement Conference too big responsibility for me undertake stop With rising consciousness excitement inevitable stop We as public servants have to take note and keep popular passion under control and then run risks stop Have been myself too often under fire to mind hostile demonstrations stop I invite you join me from Calcutta and be with me till Malikanda finished stop For me visit to Santiniketan and Malikanda is pilgrimage having no political object or significance Love.

BAPU

Calcutta 15/2/40

Mahatma Gandhi
Maganwadi
Wardha

Your telegram regret your decision not postpone Malikanda Conference though I suggested postponement after fully considering present Bengal situation and your position stop Whatever your own subjective view may be Malikanda is to Bengal a Conference of one aggressive political group within minority party in Bengal Congress stop Malikanda organizers in reality not constructive workers but faction fighters stop Public opinion will deplore your indentifying yourself with this Conference and with group organizing it





particularly because of present conflict between Bipiseesee and Oppositionist minority backed by Working Committee stop Moreover Malikanda is rallying round for those who are endeavouring exploit you politically for buttressing themselves stop Resentment against them all the greater because they are puppets of High Command who are trying suppress and humiliate Bipiseesee stop Since you have unfortunately decided reject my suggestion and accept advice of others despite prevailing Bengal atmosphere no useful purpose will be served by my joining you now stop Rather this will only accentuate present differences stop Again earnestly request postponement in view present atmosphere and public feeling please forgive intervention due only to profound regard for your personality.

SUBHAS.

যেদিন (৮ জানুয়ারি ১৯৩৮) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুভাষচন্দ্রের নাম হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে ঘোষণা করা হল, সুভাষচন্দ্র তখন ইউরোপে। তিনি দেশে ফিরলেন ২৪ জানুয়ারি। হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৫ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি। নভেম্বর মাসে লখনৌ যাবার পথে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লেখেন, 'সভাপতি হিসাবে আপনার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য অর্পণ করা আমার কর্তব্য। সে কর্তব্য এখনও সম্পন্ন হয় নাই। তাই মনের মধ্যে গ্লানিবোধ রহিয়াছে।' এই চিঠিতে কলকাতায় শ্রীনিকেতনের যে প্রদর্শনী (স্থায়ী ভাণ্ডার) উদ্‌ঘাটনের কথা আছে তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৮ ডিসেম্বর। অসুস্থতার কারণে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতে পারেন নি। সুভাষচন্দ্র সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের কথা স্মরণ করেছিলেন, 'আজ আমার ২৪ বৎসর পূর্বের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। তখন আমি ছাত্র ছিলাম এবং আমরা ১৫-২০ জন ছাত্র সেই সময় একদিন কিছু উপদেশের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে যাই। ২৪ বৎসর পূর্বে ভারতের ও বাংলার রাষ্ট্রীয় অবস্থা কী রকম ছিল তাহা বোধহয় অনেকেরই স্মরণ আছে।...যখন আমরা কবির কাছে যাই তখন তিনি কী সম্বন্ধে আমাদের বলিবেন তাহার কোনো ধারণা আমাদের ছিল না। সেই সময় পল্লীগঠন সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কী ধারণা তাহা তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের কাছে বলিলেন। তাঁহার সেই বাণীর মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ কথা ছিল না। প্রথমটা আমরা বুঝিতে পারিলাম না, বাংলার ভাবপ্রবণ যুবকদের কাছে কেন তিনি নীরস পল্লীগঠনের কথা বলিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি, তখন আমরা কোনো প্রেরণা বোধ করি নাই। তাহার পর হইতে যতই দিন কাটিতে লাগিল ততই অনুভব করিতে লাগিলাম যে, বাস্তবিক তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল্য কতখানি। ১৯২১ সালের পর মহাত্মা গান্ধী যখন দেশের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন তাহার পর হইতে পল্লীগঠনের কথা ভারতের নরনারীর মুখে শোনা যায়...কিন্তু ১৯১৪ সালে কবির মুখে আমরা সেই কথা প্রথম শুনি এবং তাহার পূর্বে আর কাহারও কাছে সে কথা শুনি নাই।' ১৯১৪ সালে কবির মুখে 'নীরস পল্লীগঠনের কথা' শুনে কোনো প্রেরণা বোধ করেন নি সুভাষচন্দ্র। ১৯২১ সালেও কবির মুখে যা শুনলেন তাতে খুব খুশি হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্স থেকে জাহাজে দেশে ফিরছেন। বোম্বাই পৌঁছান ১৬ জুলাই। একই জাহাজে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি আই. সি. এস. পাস করার পর পদত্যাগ করে

দেশে ফিরছেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর *The Indian Struggle 1920-1934* গ্রন্থে লিখছেন, 'The poet arrived in Bombay from Europe about the middle of July. As a matter of fact, I travelled in the same boat with him. During our voyage I had the occasion to discuss with him the new policy of non co-operation adopted by the Congress.' সুভাষচন্দ্রের মনে হয়েছিল যে কংগ্রেসের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কট নীতিতে বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খুবই বিপর্যস্ত বোধ করছিলেন এবং তাঁরা যে উদারপন্থী মানুষের সমর্থন পেয়েছিলেন, তাঁদের দিকে 'they had the support of no less a personality than India's illustrious poet Dr. Rabindra Nath Tagore.' —এতেও সুভাষচন্দ্রের খুশি হবার কথা নয়, তবে জাহাজে এই যোগ থেকেই কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত।

১৯১৪ সালে কবির কাছে উপদেশের জন্য যাওয়ার দু বছরের মধ্যে ওটেন সাহেবকে প্রহার উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার সূত্রে সবুজপত্রে 'ছাত্র-শাসনতন্ত্র' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের কাছে বহিষ্কৃত ছাত্রদের প্রতি সহৃদয়তার আশায় 'মডার্ন রিভিউ'তে প্রকাশিত এই প্রবন্ধের ইংরেজি তর্জমাটি পাঠিয়ে দেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কারের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সুভাষ-চন্দ্রের পক্ষই সমর্থন করেছিলেন। তবে ১৯২৮ সালে অপর একটি ঘটনায় সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ-পরিচালিত সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী-পূজা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ "প্রবাসী"তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) একটি প্রবন্ধ এবং একটি চিঠি (২৩ বৈশাখ ১৩৩৫ তারিখে লিখিত) প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে (২৫ জানুয়ারি ১৯৩৮) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লেখেন, 'সিটি কলেজের বিরুদ্ধে সুভাষ বসুর অন্যায় আক্রমণের প্রসঙ্গে তাঁর আচরণের নিন্দা করার অনুরোধ আপনাকে জানিয়েছিলুম কিন্তু তার পরেই মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা সংগত নয়। বিশেষত সুভাষ আগামী কংগ্রেস অধিবেশন যে পদ পেয়েছেন তার সম্মান কোনো আলোচনার দ্বারা ক্ষুণ্ণ করা আমাদের কর্তব্য হবে না।' তবুও যে রামানন্দবাবুকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন তার কারণ, 'সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও অন্যায়কে ক্ষমা করতে পারি নে এ আমার দুর্বলতা।' রামানন্দবাবুও অনুরোধ রক্ষা না করে রবীন্দ্রনাথকে 'অনুতাপের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।'

মন্তব্য

পত্র ১ ॥ ১৮. ১১. ৩৮

'কলিকাতায় শ্রীনিকেতনের প্রদর্শনী'। বস্তুত শ্রীনিকেতনের প্রদর্শনী নয়, শ্রীনিকেতন শিল্প-ভবনের সামগ্রী বিক্রয়ের এক স্থায়ী ভাণ্ডার খোলা হয়েছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উত্তরে ২১০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান হয়েছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির-প্রাঙ্গণে।

'৫ই ডিসেম্বর প্রদর্শনীর উদ্‌ঘাটন'। সুভাষচন্দ্রের চিঠি পেয়ে কবির সচিব অনিলকুমার চন্দ সুভাষচন্দ্রকে তার করেন, 'Gurudeva delighted with your letter replied Calcutta address. Kindly fix fifth December definitely opening exhibition Calcutta.

অনিলবাবুর তারে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে (২০. ১১. ৩৮) লিখেছিলেন, 'কখন তোমার এখানে আসবার সুবিধা হবে আমাকে জানিয়ো





—তোমার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হব।' সুভাষচন্দ্র ওয়ার্ধা থেকে জানান (১৪. ১২. ৩৮): 'জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নাগাদ "শান্তি-নিকেতনে" আসিতে ইচ্ছা করি।'

৫ ডিসেম্বর উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান হয় নি। সুভাষচন্দ্র ২৭ নভেম্বর লাহোর থেকে রবীন্দ্রনাথকে তার করেন, Shall be grateful if art exhibition fixed for fifth Calcutta be postponed till eighth. Kindly wire Congress Ambala if this possible.

রবীন্দ্রনাথ ২৮ তারিখে আম্বালাতে তারযোগে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী ৮ ডিসেম্বর উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে সম্মতি জানালেন।

'আশা করি জানুয়ারি মাসে একবার আপনার ওখানে যাইতে পারিব'। ওয়ার্ধা থেকে লেখা চিঠিতেও (১৪. ১১. ৩৮) 'জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নাগাদ' শান্তিনিকেতনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন (২০. ১২. ৩৮): 'জানুয়ারির মাঝা-মাঝি তোমার আসার প্রতীক্ষা করে রইলুম।' ১৯. ১. ৩৯ তারিখের একটি তারেও জানালেন, 'Expecting you twenty-first morning'. তারিখ এবং সময় নিশ্চিত করে সুভাষচন্দ্র দুটি তার পাঠিয়েছিলেন। ২১ তারিখ সকাল ১১টা নাগাদ বোলপুরে পৌঁছান।

'নিজস্ব 'কংগ্রেস ভবন' নির্মাণ করতে চাই কলিকাতায়'। ১৯৩৮ সালের অগস্ট মাসে কলকাতা করপোরেশন সুভাষচন্দ্র বসুর নামে উত্তর কলকাতার একটি পার্ক লিজ দেন। সেখানেই 'কংগ্রেস ভবন' নির্মাণের প্রস্তাব হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত ভবনের নাম রাখেন 'মহাজাতি সদন'।

১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের তারিখ নিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের আলোচনা হয়, সেই সূত্রে 'সুভাষ কংগ্রেস ফণ্ড'-এর সচিব নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ২৮ জুলাই একটি চিঠি লেখেন। অনিলকুমার চন্দ সুভাষচন্দ্রকে একটি চিঠিতে (২. ৮. ৩৯) ১৯ অগস্ট তারিখ প্রস্তাব করেন। সুভাষচন্দ্র উড়িষ্যার বহরমপুর থেকে ৮ অগস্ট তারযোগে ১৯ অগস্ট তারিখ নিশ্চিত করেন। অনিলবাবুর চিঠিতে উল্লেখ ছিল রবীন্দ্র-নাথের অভিপ্রায় প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে যেন মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি উপস্থিত থাকেন। মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এঁরা কেউ উপস্থিত ছিলেন না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১২ অগস্ট ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সংগঠনে যে-কোনো নির্বাচিত পদ থেকে তিন বছরে জন্য সাসপেনড করা হয়। ১৮ তারিখে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তার করেন, Delighted and grateful you are coming .Hope Rathibabu, Surenbabu, Nandalal-babu other friends will accompany you.

পত্র ২ এবং ৩ ॥ ১৩. ২. ৪০, ১৬. ২. ৪০

লখনৌর পথে ট্রেন থেকে লেখা ১৮. ১১. ৩৮ তারিখের চিঠির পূর্বেই পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনের সভা-পতি নির্বাচন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সত্যরঞ্জন বক্সি ১৫ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'We shall be grateful if you kindly write to Mahatma Gandhi and urge the re-election of Sj Bose. A word from you, revered Sir, to Mahatmaji, will carry great weight with him and will make Sj. Bose's re-election certain A message

through the press will also be of great value'. কিন্তু এ চেষ্টা সফল হয় নি। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি হন নি সুভাষচন্দ্র। নির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ে। নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রেরই জয় হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়। ১৯৩৯ সালের ৩ মে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের যে সভায় ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের কথা সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেন, সেই সভায় তারযোগে প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের এক বাণী পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন পুরীতে। এই প্রসঙ্গে নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখেন ( ৪. ৫. ৩৯ ), 'Your stirring message was read in the open meeting at Shradhananda Park yesterday, and the vast crowd of about 40000 people that had assembled kept applauding ceaselessly for fully five minutes. It has created a terrific impression in the public mind. Subhas is extremely grateful and will write to you separately'. সুভাষচন্দ্র তার পাঠালেন, 'Profoundly grateful for your message which has been widely appreciated all over the country. Am awaiting your arrival for personal discussion on several matters'. এর আগেও ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'তাসের দেশ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন, 'কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র, স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণসঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।' রাষ্ট্রীয় এই সংকটমুহূর্তে 'তাসের দেশ' উৎসর্গ খুবই তাৎপর্যবাহী ঘটনা।

তদুপরি ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রকাশ্যে সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই প্রকাশ্য সভা এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে হবে স্থির হয়। ২৬ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র এক তারযোগে বল্লভভাই এবং তাঁর বিবৃতিতে কবির প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে সুরেন্দ্রনাথ কর সেইদিনই তারযোগে জানান, Gurudeva's sympathy and blessing with you. Considers that after unseemly controversy Presidentship beneath your dignity. Would advise withdrawing. এর পরের দিনই সুভাষচন্দ্র অনিলকুমার চন্দের তারে কবির পরিবর্তিত মনোভাব জানতে পারলেন। অনিলবাবু জানাচ্ছেন, Have explained Gurudeva your difficulty in withdrawing now. He hopes election will be fought clean and without rancour. ৩১ জানুয়ারি কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে পট্টভি সীতারামাইয়ার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের জয় ঘোষিত হল। ভোটে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন এই প্রথম। নির্বাচিত হবার পরেই তাঁকে প্রকাশ্যে অভিনন্দন জানালে ভুল-বোঝাবুঝি হবে, এই অনুমানে রবীন্দ্রনাথ 'সম্পূর্ণ অনিবার্য কারণে এবং শারীরিক দুর্বলতা বৃদ্ধি হওয়াতে···অভিনন্দনসভা বন্ধ রাখতে বাধ্য' হলেন। যদিও 'দেশনায়ক' নামে অভিনন্দনপত্রটি তিনি লিখে ইংরেজি তর্জমা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এই রচনাটি কবির জীবদ্দশায় প্রকাশ করা হয় নি। পরবর্তী কালে রথীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে প্রকাশ করে দেন, 'কালান্তর' গ্রন্থের নতুন সংস্করণে এটি স্থানও পেয়েছে। ২০ মে মংপু থেকে লিখলেন, 'আজ আমি জানি, বাংলাদেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের।' তিনি সুভাষচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় তাঁর নিজের ( রবীন্দ্রনাথের ) 'সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন' এ প্রতিশ্রুতিও দেন। ১২ অগস্ট ওয়ার্ধায় রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তিন বছরের জন্য সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের যেকোনো কমিটিতে নির্বাচিত হতে পারবেন না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। ১৯ অগস্ট সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ 'মহাজাতি সদন'-এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলেন। এর মধ্যে যদিও সুভাষচন্দ্রের স্থানে নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ চম্পারন থেকে পুরীতে রবীন্দ্রনাথের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে তার করেছিলেন, 'Paramguru Rabindranath Tagore Puri. Seek your blessings. Trying time ahead.' আশীর্বাদ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পেয়েছিলেন কিনা জানা নেই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন, 'মহাত্মাগান্ধী ও সুভাষবাবুর সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও বুঝাপড়া হইলে এই অনিষ্ট অনেকটা নিবারিত হইতে পারে। আপনি যদি তাঁহাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার পক্ষে কিছু করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের কল্যাণ হয়' ( ১৩. ৪. ৩৯ )। সুভাষচন্দ্রের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুরোধের উত্তরে গান্ধীজী জানালেন তা সম্ভব নয়। এবং অ্যাণ্ড্রুজকে ১৫ জানুয়ারি গান্ধীজী লিখলেন, 'I feel that Subhas is behaving like a spoilt child of the family.' এবং ব্যাপারটা নাকি 'too complicated for Gurudev to handle.'

সুভাষচন্দ্র ৩ জুলাই থেকে কলকাতায় হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য আন্দোলন শুরু করার আগের দিনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ। যদিও এর পরেও পত্রযোগ অব্যাহত ছিল।







'আসন্ন মালিকান্দা সম্মেলন'। এই সম্মেলনে যেন গান্ধীজি না আসেন সেই মর্মে একটি বিবৃতি প্রচারিত হয়:

শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা

গান্ধীজি,

আপনি শীঘ্রই বাঙলাদেশে আসিতেছেন। কিছু দিন পূর্বে হইলে আপনার এ আগমনকে আমরা সগৌরবে অভিনন্দিত করিতে পারিতাম, কারণ তখন পর্যন্ত আপনি ছিলেন 'মহাত্মা' এবং সর্ব ভারতের নেতা।

আপনি যে দলের নেতা, বাঙলাদেশে সে দলের বিন্দুমাত্রও প্রভাব নাই। বাঙালী চায় পূর্ণ স্বাধীনতা, বাঙালী বিশ্বাস করে যে সেই স্বাধীনতা ব্রিটিশের পদলেহন করিয়া পাওয়া যায় না, সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতর দিয়া অর্জন করিতে হয়। আপনার দল ঘটনাচক্রে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সর্বনিয়ন্তা আপনারা প্রতি পদে-পদে বিপ্লবী চিন্তা ও মনকে পিষ্ট করিবার ইচ্ছায় বাঙলার জাগ্রত বুদ্ধিকে পদদলিত করিয়াছেন, বাঙালী তথা ভারতের স্বাধীনতার সৈনিকবৃন্দকে অপমানিত করিয়াছেন।

আপনার নির্দেশ ও সমর্থনে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বাঙলা তথা ভারতের জাতীয়তাকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

স্বাধীনতাকামী কোনো ভারতবাসীই আপনাকে বিশ্বাস করে না। বাঙালী আপনাকে চায় না, ইংরাজের বন্ধু, পরধর্মলিপ্সু মিলওয়ালাদের আপনার লোক, মন্ত্রী উজিরদের বিশ্বস্ত প্রভু গান্ধীজিকে দিয়া সর্বস্ববঞ্চিত বাঙালীর কোনো প্রয়োজন নাই।

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি আপনার হাতের পুত্তলি মাত্র। এই কমিটির সাহায্যে আপনি বাঙলাকে পদে-পদে অপমানিত করিয়াছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ নিজ দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাঙালীর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান বি-পি-সি-সি'র উপর বেআইনি ভাবে

এড্‌হক্‌ কমিটি চাপাইয়া দিয়া উহা ভাঙিয়া দিলেন, বাঙলার বন্দীদিগকে ইংরাজের হাতে সঁপিয়া দিয়া সেই ইংরাজের সঙ্গেই মিতালি করিবার আনন্দে আকুল হইলেন।

একটা স্বার্থপর দলের নেতা গান্ধীজিকে বাঙালী চায় না, তাঁহাকে আমল দেয় না, বাঙালী তাঁহাকে অবিশ্বাস করে।

আপনার বাঙলায় আগমনকে তাই আমরা সন্দেহের চক্ষে দেখি। সুতরাং আপনার ব্যক্তিক-মঙ্গল কামনা করি বলিয়াই বাঙলাদেশে আপনাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছি, আপনি অবহিত হউন।

বিনীত

মালিকান্দা, মেঘুলা, নবাবগঞ্জ, রাড়িখাল, মাইঝপাড়া, প্রাণী-মণ্ডল, গোবিন্দপুর, বায়রা, কলাকপা, বান্দুরা প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ।

এই হ্যাণ্ডবিলটির প্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবেন নলিনীরঞ্জন সরকার।

'গান্ধীজি ওখানে আসছেন'। গান্ধীজি বাংলা পরিভ্রমণসূত্রে সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন ১৭ ফেব্রুয়ারি। তিনি সুভাষচন্দ্রকে জানান, 'for me visit to Santiniketan and Malikanda is pilgrimage having no political object or significance.'

এই উপলক্ষে রবীন্দ্র-অনুরাগী কেউ-কেউ রবীন্দ্রনাথকে গান্ধী-সুভাষ বিরোধের ঊর্ধ্বে থাকতে অনুরোধ করে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির শান্তিনিকেতন পরিদর্শনকালে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। তবে এর কয়েকদিনের মধ্যেই ২৪. ২. ৪০ তারিখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'সুভাষবাবুর মত ও পথের অনুবর্তী নহে বলিয়া তিনি কয়েকটি কাগজকে বয়কট করাইবার নিমিত্ত একাধিক বক্তৃতা করিয়াছেন।·· আপনি যদি এই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ চেষ্টার বিরুদ্ধে দু-একটি কথাও লেখেন, তাহা হইলে বড়ো উপকার হয়।' পরের দিন ২৫ ফেব্রুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েকজনের স্বাক্ষরে 'Press cannot be Terrorised' শিরোনামে এক বিবৃতি প্রচারিত হয়। রামানন্দবাবুর অনুরোধ ছাড়া নলিনীরঞ্জন সরকারও একই মর্মে 'সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সনির্বন্ধ অনুরোধে' এক চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথ এঁদের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন বলে জানা নেই।

পাদটীকা ও মন্তব্য

**শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়**


**কৃতজ্ঞতা স্বীকার :**

১. রবীন্দ্র-জীবনী, চতুর্থ খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
২. ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্র, পঞ্চম খণ্ড, শ্রীনেপাল মজুমদার
৩. রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র, শ্রীনেপাল মজুমদার
৪. পুলিনবিহারী সেন-সংগ্রহ এবং তৎকর্তৃক রক্ষিত নোট



সাহিত্য অকাদমির প্রাক্তন ক্ষেত্রীয় সম্পাদক ড. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় প্রবীণ সাহিত্যসমালোচক, গবেষক এবং রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ।




## যামিনী রায় ও আমরা

শেষ কিস্তি

**প্রণতি দে**

কলকাতায় বোমা পড়ায় আমাদের পরিবারের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে গেল। মা (আমার শ্বাশুড়ি) এত বিচলিত হয়েছিলেন—তাঁর চার ছেলে আর বড়ো মেয়ে কলকাতায় ছিলেন—যে প্রচণ্ড শরীর খারাপ হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত উনিই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সেই সময়েই আমাদের একটি পুত্রসন্তান হয়, কিন্তু মা তাকে দেখে যেতে পারেন নি। জানি না, আমার ধারণা যে এর পর থেকে যামিনীদার আমাদের বিষয়ে, অন্তত আমার স্বামীর বিষয়ে, নিশ্চয়ই মমতা বেড়ে যায়। এবং, বলা যায় কি—"দায়িত্ব"। যামিনীদা যেন খানিকটা ওঁর এবং আমাদেরও অভিভাবকেরই দায়িত্ব নিলেন।

১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতার জীবনে যা বিপর্যয় ঘটে গেছে, এখনও চিন্তা করলে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ছেচল্লিশে রক্তগঙ্গা বয়ে যায় আমাদের বাড়ির সামনে আর আশেপাশে। আমার স্বামী মার খান আমাদের দেশবাসীর কাছে। ওঁর বাঁ হাত তো জখম হয়ে ছিল বহু মাস। বাঁ কাঁধের হাড়ে ফ্র্যাকচার—সে যে কী কষ্ট। বছর দুই নানান চিকিৎসা করে, ডাক্তার সুবোধ মিত্রের ইলেকট্রিক-ট্রিটমেন্ট, ম্যাসাজ, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়মিত খেয়ে, তারপর হাতটা খানিকটা স্বাভাবিক-ভাবে ব্যবহার করতে পারতেন।

যামিনীদা তখনও বাগবাজারে, পটলই আসত খবরাখবর নিতে। তখন থেকেই নিয়ম হয়ে গেল—আমাদের পরিবারে কারুকে কোনো উপহার দিতে হলে, বিশেষ করে বিয়েতে, যামিনীদার ছবিই শ্রেয়। আমার স্বামী একবার কালীঘাট থেকে তিনটে পটের ছবি এনে যামিনীদাকে দেন—সেই তিনটিই যামিনীদা বড়ো করে আঁকেন ওঁর স্টাইলে : একটি মেয়ে বেহালা বাজাচ্ছে, আরেকটি তবলা, আর আমাদের বাড়িতে যেটা যামিনীদা ওঁকে দিয়েছিলেন, উনি আমাকে

দিয়েছিলেন, আমি বাঁধিয়ে আনিয়ে রাখি—মেয়েটির হাতে গোলাপফুল। আমরা বলতাম "গোলাপসুন্দরী"। কিন্তু ছবি তিনটিই আঁকা যামিনীদার ধরনে, মোটা রঙে, কিন্তু "পটুয়া" বলা যায় না। অনেক বেশি সুন্দর। আমি তো তিনটি ছবিই দেখেছিলুম—তাই তফাতটা বুঝতে পারি।

আমার স্বামী একটা ছোট্ট রাশিয়ান আইকনের ছবি পেয়েছিলেন—যীশুকে ক্রস থেকে নামানোর পর—নাম "লা পিয়েতা"—সেটিরও যামিনীদা কপি করেন ওঁর মোটা রঙ, তেল দিয়ে। তারও একটি কপি আমার স্বামী কিনে আনেন। ১৯৪৩-৪৪ সালের মধ্যেই তো জন আরুইনের সঙ্গে আমার স্বামীর লেখা বইটি ছাপা হল, স্টেলা ক্রামরিশের সাহায্যে, সোসাইটি অভ ওরিয়েনটাল আর্ট থেকে। এই বইয়ের প্রকাশ নিয়ে যামিনীদার মনে দ্বিধা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বইটি প্রকাশিত হয়। এই সময়ে যামিনীদা আর আমাদের সকলের আরেকজন বন্ধু হন মিসেস মে কেসি। তিনি নিজেও ছবি আঁকতেন, সেজন্য যামিনীদাকে এবং কলকাতার আর্টিস্টদের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। আমার মনে পড়ছে, মিসেস কেসির উৎসাহে গভর্নমেনট হাউসে একটি প্রদর্শনী হয় ভারতীয় নানান শিল্পকলা নিয়ে। যামিনীদা নিজে এই প্রদর্শনীটি সাজাতে সাহায্য করেছিলেন। স্টেলা ক্রামরিশও ছিলেন। মিসেস কেসি চলে যাবার আগে যামিনীদা এবং অন্যান্য আর্টিস্টদের—গোপাল ঘোষ, নীরদবাবুও বোধ হয় ছিলেন (তখন বিদেশে যান নি—সঠিক আমার স্মরণে নেই), রথীন মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল, পরিতোষ সেন এবং অন্যান্য আর্টিস্টদের—ছবি কিনেছিলেন নিজেরই জন্য, এবং অন্যান্য জায়গায় উপহার দেবার জন্য। যেমন, আমার মনে পড়ে, ১৯৪৪ সালেই বোধ হয়, মেডিক্যাল কলেজের একটি নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছিল শিশুদের জন্য। মিসেস কেসিকে ওটা খুলতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেন যে উনি ওখানে কটা ছবি উপহার দেবেন। অনেক ছবিই কিনেছিলেন। আমাকে বলেন, আমি আমার স্কুলের জন্যে একটা নিতে পারি। আমি ভীষণ খুশি হয়ে যামিনীদার সবথেকে বড়ো আর সুন্দর ছবিটি—কয়টি ছোটো সাঁওতাল ছেলে—বেছে নিয়েছিলুম। অন্য ছবিগুলিও খুব সুন্দর ছিল। মনে পড়ে গোপাল ঘোষের সূর্যাস্তের রঙিন আকাশ—এখনও আমার চোখে ভাসে; প্রাণকৃষ্ণ পালের বেলুনওয়ালার রঙবেরঙের নানা বেলুনের অপূর্ব ছবিটি—শিল্পীর নিজেরও এ কথা স্মরণে ছিল। আমায় পরে বলেছিলেন একদিন।

১৯৫০ নাগাদ যামিনীদা উঠে এলেন ডিহিশ্রীরামপুর লেনের বাড়িতে। তখন ওই নাম ছিল। যামিনীদা বোধ হয় অনেক আগে, সস্তার সময়ে খানিকটা জমি কিনে রেখেছিলেন। বাগবাজারের বাড়িটা ওঁর ছবির পক্ষেই ছোটো হচ্ছিল। তাই এ বাড়ি করেছিলেন—"ছবিরই বাড়ি" বলতেন। ১৯৩৫ বা ৩৬-এর পর বোধ হয় আর এগজিবিশন করেন নি—অল্প জায়গা, সময় অকারণে নষ্ট, বড়ো অযথা পরিশ্রম, মানুষকে অল্প জায়গায় আসতে বলা ছবি দেখতে, এ পরিবেশ ঠিক নয়—এই ধরনের ছিল যামিনীদার মতামত। তাই ছবি আঁকা হবে, সাজানো থাকবে, যাঁর যখন সময় বা ইচ্ছা আসবেন, দেখবেন, বসবেন, খুশি হয়ে যাবেন—এইরকম নিজের বাড়িটা করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। নিজেই নকশা করেছিলেন। ওঁর "ছবির বাড়ি"র দোতলা-তেতলায় ওঁরা থাকবেন ছবির দেখাশোনা করতে—ছবি ঠিকমতো যাতে থাকে, তারই ব্যবস্থাপনায়, তাই নীচে প্রতিটি ঘরে বড়ো-বড়ো জানালা, উত্তরে। দক্ষিণ চাপা, কারণ আর্টিস্টের পক্ষে প্রয়োজন—উত্তরের স্টেডি আলো। সকলেই জানেন যে কলকাতায় সন্ধ্যার সময়ে দক্ষিণের বাতাসটা বড়োই সুখকর, সারাদিনের গরমের পরে। সেজন্য সকলেই দক্ষিণ দিকে দরজা জানালা বারান্দা রাখেন। কিন্তু যামিনীদার বাড়ি তো "ছবির জন্য"—আর্টিস্টের কাজের জন্য প্রয়োজন উত্তরের আলো—তাই সেই







ব্যবস্থা। নিজে বসে আঁকতেন ছোট্ট চলনে, সামনে চৌকি আর পাশে গামলাভর্তি জলে একগাদা তুলি, চারদিকে বসানো রঙের বাটি। ক্লান্ত লাগলে ওখানেই বা অন্য ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে পড়তেন খানিকক্ষণ। কারুর অনুরোধে ছোট্ট একটু ফাঁকা জায়গা রেখে-ছিলেন বাইরে—অনেক সময় দিনের কাজ সেরে উপরে উঠে যাবার আগে ওখানেই একটি আরাম-চেয়ারে কিছুক্ষণ বসে থাকতেন।

আমার স্বামী অনেক সময় বিদেশী বন্ধুদের ছবি দেখিয়ে যামিনীদার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় নিরিবিলিতে বসে কথা শুনতেন। কারণ যামিনীদার ছিল জীবন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, আমাদের দেশজ জীবনধারার জ্ঞান—তাই তাঁর কথা শুনতে দারুণ ভালো লাগত। তাঁর বলার ধরনেও বিশেষত্ব ছিল—যা ভোলা যায় না। অনেক রাশিয়ান বন্ধুদের উনি সেই সময়ে নিয়ে গেছেন জানি—সে বিষয়ে উনি লিখেছেনও।

যামিনীদা তো নতুন কিছু করলেই ওঁকে না দেখাতে পারলে স্বস্তি পেতেন না। গর্বের সঙ্গে জানাতেন—কী নতুন একস্‌পেরিমেনট হচ্ছে দেখলেন! মোসেইক ধরনের ছবি। সেই থেকেই মনে হল বোধ হয় কার্ডবোর্ড স্লিপ দিয়ে বুনে-বুনে তার উপরে ছবি আঁকা—দারুণ মোসেইক এফেক্ট আসত। এ ছাড়াও, তালপাতা বুনে-বুনে শুকিয়ে নিয়ে ছবি আঁকার নতুন ব্যাকগ্রাউনড—সুন্দর হত—আমাদের দুটো ছোটো ছবি আছে—এই বোনা তালপাতার উপরে আঁকা—একটি সাঁওতাল ছেলে, অন্যটি গণেশ। আমার স্বামীর জন্মদিনে একবার গিয়ে দেখি—বাগবাজারের গলির ছবি আঁকা হয়েছে—আমি তক্ষুনি সেটা কিনে নিলুম, দোকানে বাঁধিয়ে ওঁকে উপহার দিয়েছিলুম। উপহার দেবার হলে আমি যামিনীদাকে বলেও আসতুম, আমার বা আমার শ্বশুরবাড়ির কোনো আত্মীয়ের বিয়ে—যামিনীদা তেমনি ছবি এঁকে দিতেন। যেমন, একজনের নাম পার্থসারথি—দারুণ যণ্ডের রথের ছবি, ঘোড়া আর দুটি মূর্তির রূপ—অপরূপ ছবি পেলুম। আরেকটি এঁকে দিয়েছিলেন আমার অনুরোধে, আমারই এক আত্মীয়ের জন্য—দুটি ময়ূর, মধ্যে গাছ, রাধাকৃষ্ণ নৃত্যরত। ডিরেন (Derain)-এর একটি প্রিনট আমার স্বামী যামিনীদাকে দেখিয়েছিলেন—সহজ সুন্দর ছবি—একটি বড়ো গাছ আর তার বৃহৎ ছায়া লাল রাস্তায় এসে পড়েছে। ওঁর রঙে এমন সুন্দর এঁকে দিলেন যেন আমাদের দেশেরই গ্রামছাড়া রাঙা মাটির পথে সবুজ গাছের ছায়া—সেটা দেখেই আমার স্বামীর ভাইপো এবং একান্ত বন্ধু গোবিন্দবাবু কিনে নিয়েছিলেন। যেমন নিয়েছিলেন অপূর্ব একটি তেলরঙে আঁকা, একটু ঝুঁকে দাঁড়ানো রবীন্দ্রনাথের বড়ো পোর্ট্রেট ছবিটি।

আমি তখন কমলা গার্লস স্কুলে কাজ করছি। আমাদের ছাত্রীরা বেশ ছবি আঁকত—আমাদের প্রেসিডেনট চারুচন্দ্র বিশ্বাস, যাঁর আমার কাজের উপর বেশ বিশ্বাস আর আস্থা ছিল—তাঁর কাছে থেকে অনুমতি নিয়ে শান্তুকে (নীরদ মজুমদারের বোন) অনেক রুটিন অ্যাডজাস্ট করে ব্যবস্থা করে ঢুকিয়েছি। শান্তু তখনও আর্ট কলেজের ছাত্রী, পাশ করে বেরোয় নি, কিন্তু আমাদের ভালো আর্ট টিচারের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল বলে ব্যবস্থা করেছিলুম। একদিন যামিনীদার কাছে অনুমতি নিয়ে আমি এক রবিবার সকালে কিছু ছাত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলুম। যামিনীদাও আমাদের ছাত্রীদের সঙ্গে বসে আঁকলেন—মেয়েদের সে যে কী আনন্দ, বুঝিয়ে বলা যায় না।

যামিনীদার যত্নের কথা বলব? তারার কথা বলতেই হয়। ওর শরীরটা ভালো ছিল না, ছেলে-বেলায় বেশ ভুগেছে, সেই বেলেতোড়ে থেকেই রোগা—পরেও অনেক বছর ধরে ভুগেছে। যামিনীদা অনেক বছরই দেখলেন, শেষে আমায় বললেন হোমিওপ্যাথি করাতে। ওঁর নিজের ডাক্তার—ডা. চুনীলাল সান্যালকে পটলের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়েই দিলেন—আর ধন্বন্তরির মতো তারার অমৃত সত্যিই সারল।

মনে পড়ে, আমি যে স্কুলে কাজ করতুম, সেখানে ১৯৪৮ সালে আমাদের ছাত্রীরা খুব সুন্দর নৃত্যনাট্য "শকুন্তলা" মঞ্চস্থ করেছিল, আর ছোটো মেয়েরা "সাত ভাই চম্পা" করে বেশ নাম করেছিল। ১৯৪৯ সালের প্রাইজে আমরা রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা"-র প্রথম দৃশ্যটি করেছিলুম। অনেক দিন ধরেই আমার স্বামী আমাকে "চণ্ডালিকা" করাতে বলেছিলেন। প্রথম দৃশ্যটি তাই কীরকম হয়, দেখবার জন্য করা হল। আমাদের গভরনর ডা. কাটজু "চণ্ডালিকা" দেখতে চান, তাই লাটভবনে তিনি স্টেজের ব্যবস্থা করে দিলেন। একটা দৃশ্য দেখে তিনি আমায় হেসে বললেন, 'আমি সবটা দেখতে চাই—কমা, সেমিকোলন যেন বাদ না যায়।' আমরা এক-বছর পরে সমস্তটা মঞ্চস্থ করে ওঁকে দেখাই—সেদিন রাখীবন্ধনের দিন, আমাদের ছাত্রীরা ডা. কাটজুর হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিল। আমার স্বামীকে ড্রেস-রিহার্সাল দেখতে আসতে বলেছিলুম আগের দিন—কিছু ওঁর বক্তব্য থাকে বা বদল করার কথা মনে হয়, উনি বলে দিতে পারবেন, আমরা শুধরে নিতে পারব। স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রবাবুই ( কবি-গীতিকার-সুরকার-গায়ক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ) ছিলেন হালে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী সবিতা বাগচী আর নৃত্য-পরিচালনায় শ্রীঅনাদিপ্রসাদ। আর সঙ্গতের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রবাবুই তাঁর বিশ্বস্ত শিল্পীদের আনলেন—তাঁদের প্রত্যেকের যন্ত্রের সঙ্গে নাম মিলিয়ে মজা করে তাঁদের ডাকতেন। রিহার্সাল দেখার পর আমার স্বামীই আমাকে বললেন যামিনীদাকে নিমন্ত্রণ করতে। নিজের এত সাহস হয় নি। আমি জানতুম—যামিনীদা অনেক বছর ধরেই বাঙলা নাট্যশালা বিষয়ে উৎসাহী এবং অভিজ্ঞ। অনেক বড়ো ক্রীনও এঁকে দিয়েছিলেন, আমাকে বেলেতোড়েই গল্প করেছিলেন। অভিনেত্রীরা ওঁকে কবিরাজ ভাবতেন—অনেকেই ওঁদের মেয়েদের জন্য ওষুধ চাইতেন—"বাবা" বলে সম্বোধন করতেন। 'বাবা, তোমায় বললুম আমার মেয়ের জন্য ওষুধ দিতে, দিলে না তো।' সেজন্য আমার স্বামীর কথায় সাহস পেয়ে আমি ওঁকে নিমন্ত্রণ করলুম। যামিনীদা এসেছিলেন, এবং আমরা যে কী প্রশংসা পেয়েছিলাম তা ভুলবার নয়। ১৬।৮।৫৫ তারিখের চিঠিতে লিখলেন :

প্রিয়বরেষু,

ভাববেগে মুগ্ধ হোয়ে লিখছি, তা তো নয়ই—শুধু আপনাকে জানান দরকার মনে করি—তাই আর অপেক্ষা করতে পারলাম না, আমি শুধু ভাবছি, প্রতিদিন প্রতি ঘটনার প্রতি গড়নে যে দাম দিয়ে এই অভিজ্ঞতা কেনা যায়—আজকার এই অভিনয়টিও তার মধ্যে একটি—, আগের অভিনয়ের-ও প্রতি অংশের সমান দক্ষতা ছিল, তথনও এমনি ক্ষুব্ধ হয়ে-ছিলাম তবে এবারের বেশী তীব্র চণ্ডালিকা ও মায়ের অংশে যে মেয়ে দুটির—যেমন দক্ষতা, তেমনি অত বড় স্টেজকে রাখার ক্ষমতা, যাঁরা পেশা নিয়ে প্রতিদিন অভিনয় করেছেন, তাঁদেরও বেশ বেগ পেতে হত বাঙ্গালী পল্লীর মধ্যে—অনেকটা ঘরোয়া পরিবেশের স্টেজের উপর আধিপত্য করতে। আর এই মেয়ে কটী কতই বা বয়স, বছরে এক দুবার অভিনয় কত বড় দুঃসাধ্য কাজ, মমতায় অন্তরটা ভরে যায়—এই সে এক একটি মানুষ—জীবএর সম্ভাবনাকে অপচয় করার অপরাধ, দেখে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারি না। যে সভ্যতায় যে সমাজব্যবস্থায় আর কতদিন এবং কতখানি দাম দিতে হবে। পেশাদার থিয়েটারের এবং নৃত্যশালায় এমন কি গ্রাম্য যাত্রার দলেও—সব জায়গাতেই ঘনিষ্ঠ-পরিচয় আমার আছে দেখেছি। তাঁদের উহাই একমাত্র কাজ। এবং চিন্তা দুপক্ষেরই সংঘটক-শিক্ষক, পোশাক ( সজ্জাকর ) অন্যান্য খুঁটিনাটি প্রতি বিভাগে বহু-দিনের অভ্যাসের দক্ষতা—তবু কত এদিক ওদিক হয়ে যেত প্রায়ই। আর—এই অভিনয়টির সংঘটক, প্রযোজক, শিক্ষক, সবার উপরে প্রধান যিনি যাঁর উপর সব কিছু দায়িত্ব, ও সব কিছু নির্ভর করছে তাদের সকলেরই ভিন্ন কাজ ভিন্ন চিন্তা। তাঁদের এই







সুশৃঙ্খলতার চিহ্ন অভিনয়ে সবটুকু জুড়ে, এবং সকল অংশেই, যারা ক্ষুদ্র অংশে অভিনয় করেছে তাদের দক্ষতাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তয়াজ করে অভিনয়ে প্রত্যেকটি মেয়ে এবং শিক্ষক, সজ্জাকর, প্রযোজক সমান আদর পাওয়ার অধিকারী।

আর একটি চিঠি—তারিখটা একটু আগের—

২৪।৪।৫৪

১৮ ডিহি শ্রীরামপুর লেন

বালীগঞ্জ

প্রিয়বরেষু,

একবার দেখা করার ও কথা কওয়ার জন্য মন খুব অস্থির হয়েছিল। স্কুলের ছাত্রীদের অভিনয় দেখে আসার পর থেকে আরও তীব্র। একটা উপলক্ষকে আশ্রয় করে মনের এই জ্বালা, দেহজীর্ণ, কায় এই তাণ্ডব সহ্য করা দায়। গতবারে ও এইবারেও অভিনয় দেখে কেবলি মনে হয়—এই কটি বালিকাকে নিয়ে পৃথিবী জয় করা যায়।……নৃত্যের মাধ্যমে অভিনয় অথচ নৃত্যের প্রধান আশ্রয় ঘুঙ্গুর ওপর। রং নাই তুলি নাই ছবি আঁকতে বসা। ঘুঙ্গুরের ধ্বনিতে কাম উদ্রেক করে—তাই এদেশে ( বাংলায় ) নূপুরের আবিষ্কার—তবলার পরিবর্তে খোল। এত বড় আবিষ্কার মনে হলে মাথা আর মর্তে থাকত না।

কমলা স্কুলের এই নৃত্যগীতানুষ্ঠানের জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আরো দারুণভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। তখন সব স্কুল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। বি-টি পরীক্ষার্থীদের "প্র্যাকটিশ টিচিঙে"র জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সামান্য কিছু দিতেন, যে শিক্ষয়িত্রীদের ক্লাস নেওয়া হত তাঁদের। কারণ, হয়তো তাঁদের আবার নিজের সময়-সুবিধানুযায়ী সেই বিষয়গুলি পড়িয়ে দিতে হত। এই অর্থটি প্রতি বছরই যে শিক্ষয়িত্রীদের ক্লাস নেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হত। এক বছর, আমার সহকর্মীরা আমাকে এসে বললেন—এই অর্থ তাঁরা নেবেন না, সেটি দিয়ে যামিনী রায়ের কিছু ছবি কেনা হোক। ছাত্রীরা দেখবে, উপকৃত হবে—আমাদেরও ভালো লাগবে। এই সামান্য টাকা তো ফুরিয়েই যায়। তার থেকে স্কুলের জন্য সুন্দর জিনিস থেকে যাবে—অনেক উপকার হবে ছাত্রীদেরই। আমি যামিনীদাকে গিয়ে বলতে উনি খুব খুশি হলেন, বললেন, 'বেশ তো, তোমাদের মেয়েরা এমন ভালো অভিনয় করে, ওদেরই ভালো হবে।' আমায় বললেন—'তোমরা একদিন এসে ছবি বেছে নাও।' আমরা কজনে গিয়েছিলুম মনে নেই। প্রতি ক্লাসের জন্য একটি করে দশটি ছবি আমরা বেছে নিয়েছিলুম। একটু ছোটো সাইজ আমরা নিয়েছিলুম, খুব বড়ো ছবি আমরা বাছি নি। আমাদের বাড়িটা তখন ছোটো, বেশি সেকশন নেই। হাতে অর্থও কম। কিন্তু যামিনীদার খেয়াল ছিল, তখন ওঁর নাতনিরাও আমাদের স্কুলে পড়ত। যামিনীদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কটি করে সেকশন? আমাকে দ্বিধাভরে জানাতে হল—দুটি। ফলে উনি আমাদের আরো দশটি ছবি উপহার দিলেন। আমাদের এত কম টাকা ছিল যে আমরা খুব লজ্জিত হয়েছিলুম, কিন্তু যামিনীদা জোর করেই বললেন—এ ছবি আমি ছাত্রীদের উপহার দিচ্ছি তাদের সুন্দর নৃত্যগীতাভিনয় দেখে—তখন আমরা আর কী বলব? কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হয়ে নির্বাক হয়েছিলুম। আমাদের আরো বলে দিলেন যেন প্রতি মাসে ছবিগুলো পালটিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সব ক্লাস নতুন ছবি দেখতে পাবে—ওদের আনন্দ আর শিক্ষা দুই-ই হবে। এমন আনন্দের ব্যবস্থা যামিনীদা আমাদের বিদ্যালয়ের জন্য করে দিয়েছিলেন—আমাদের পক্ষে তো কল্পনাতীত, কিন্তু কী গর্বের, আর কী অসামান্য দরদের কথা! আমাদের "হলঘর" যখন স্কুলবাড়িতে তৈরি হয়, তখন সাহস করে আমি যামিনীদাকে বলতে পেরেছিলুম—'আমাদের স্টেজটা একবার দেখবেন—কী রকম হয়েছে?' যামিনীদা আমার সঙ্গে এসেছিলেন আর উপদেশ দিয়েছিলেন—তোমাদের মেয়েরা যখন নৃত্য বা অভিনয় করে, ছবির মতো দেখায়। কাজেই,

তোমরা স্টেজের চারপাশে ছবির যেমন ফ্রেম থাকে, তেমনি করে কাঠ দিয়ে বাঁধিয়ে নাও—ছবির মতোই দেখাবে। যামিনীদার কথাটি আমরা পালন করতে পেরেছিলুম—স্টেজের চারপাশটা ছবির ফ্রেমের মতো কাঠের ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো পালিশ-করা। আমি শম্ভুবাবুকেও (স্বামীর জোরে অবশ্য) অনুরোধ করেছিলুম স্টেজের মাপ ঠিক করে দিতে। উনিও এসেছিলেন এবং নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বোধহয় অর্থাভাবের জন্যেই ওঁর সব নির্দেশ পালন করা হয় নি।

আমার স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু যাঁরা ওঁকে বুঝতেন সম্পূর্ণরূপে, তাঁদের মধ্যে যামিনীদা ব্যতীত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—এবং ওঁর নিজের বয়সের আর মননের এবং সবরকমের পছন্দের দিক থেকে ওঁর বয়সের নিকটতম বোধ হয় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র আর চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। সুধীনবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব যে কবে থেকে, তা উনিও সঠিক বলতে পারেন নি—অনেক কালের, প্রায় ছেলেবেলা থেকে ওঁর 'অ্যাডমিরেশন'। সত্যেনবাবুর বিষয়েও তাই; প্রগাঢ় হয়ে ওঠে "পরিচয়"-এর আড্ডার সময়ে। সত্যেনবাবুই তো "পরিচয়" পত্রিকা প্রকাশ করার কথা সুধীনবাবুর বাবাকে বলেন এবং সমর্থন পান। যামিনীদাও বাগবাজারের বাড়ি থেকে "পরিচয়"-এ আড্ডায় যেতেন মাঝে-মাঝে। প্রথম "পরিচয়"-এর মলাটের ছবি তো যামিনীদারই আঁকা। পরে সেই ছবিটি সুধীনবাবু আমার স্বামীকে দেন—সেটি এখনও আছে।

১৯৪২-৪৩-৪৪ সাল নাগাদ সুধীনবাবু সরে যান যামিনীদা, সত্যেনবাবু আর আমার স্বামীর কাছ থেকে। আমি জানতুম এই বিচ্ছিন্নতায় এঁরা তিন-জনেই খুব মানসিক কষ্ট পাচ্ছিলেন। আমি জোর করেই খানিকটা আমার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারি—আমরা দুজনেই রাজেশ্বরীর (সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় স্ত্রী, রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী রাজেশ্বরী বাসুদেব) গানের ভক্ত ছিলুম বলে। শেষের দিকে সুধীনবাবুও বোধহয় রাজেশ্বরীকে নিয়ে যামিনীদার বাড়িতে গিয়েছিলেন—খানিকটা হয়তো আমার স্বামীর তাগিদেই। সুধীনবাবুর মৃত্যুর কিছু আগে থেকেই আমি ছবিদির বাড়ি যেতুম। হাজরা রোডে যখন সুধীনবাবু আর ছবিদি থাকতেন, তখন তো নিয়মিত আমার স্বামী আর আমাদের বড়ো মেয়ে ইরাকে নিয়ে যেতুম—ওঁরা দুজনেই ইরাকে ভালোবাসতেন। সুধীনবাবুর মৃত্যুর পর আমি নিয়মিত যাদবপুর থেকে ফিরতি পথে ছবিদির কাছে যেতুম। পুরনো দিনের স্মৃতি নিয়েই ছবিদি বেঁচে ছিলেন। সেই স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করে আনন্দ পেতেন। অসম্ভব কষ্ট হত, কিন্তু জানতুম তো যে ছবিদির আর কোনো বন্ধু নেই। তাই কলেজ-ফেরতা প্রায়ই যেতুম। আমার স্বামী জানতেন আমি ছবিদির কাছে যাই, গল্প করি, ছবিদির কথা শুনি—উনি সমর্থন করতেন।

একদিন উনি যামিনীদার কাছে এসব কথা বলেছেন। যামিনীদার সঙ্গে ছবিদির আলাপ হয়েছিল সুধীনবাবুর পৈতৃক বাড়িতে "পরিচয়"-এর প্রারম্ভেই। তাই একদিন যামিনীদা আমায় বললেন—'বউমা, তুমি আমাকে ছবির বাড়ি নিয়ে যাবে?' আমি একদিন ট্যাক্সি করে যামিনীদাকে নিয়ে গেলুম কেয়াতলায় ছবিদির বাড়িতে। ছবিদি খুব খুশি হলেন। আর উনি যেমন আমার কাছে গল্প করতেন, খানিক কাল্পনিক, খানিক পুরনো ঘটনার রেশ ধরে, তেমনি বলতে লাগলেন—জানেন যামিনীদা, এই গত বুধবার রাত্রে উনি আমার কাছে ছিলেন। তার আগেও আমার এখানে প্রায়ই আসতেন। কয়েক সপ্তাহ আগে, সারারাত ধরে উনি, বাবুল, আমি লেকের ধারে খবরের কাগজ পেতে কত গল্প, কত আড্ডা—জানেন না? জানেন যামিনীদা, এক ভৈরবী ওঁদের সকলকে বশ করেছে, সে কারুকে রাখবে না, জানেন, সকলকে শেষ করে দেবে ইত্যাদি। কত কী বললেন। যামিনীদা নীরবে শুনলেন, দু চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল! একটু পরে আমি যামিনীদাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরলুম।

আমার মনে পড়ছে, একবার উনি বলেছিলেন যামিনীদাকে—আপনি তো একটাও মজুরের ছবি আঁকলেন না! তখন যামিনীদা কটা মজুরের জোরালো ছবি এঁকেছিলেন। প্রায়ই স্কেচ পেতেন। অনেক সময়ে তার পাশে, বা উপরে যামিনীদা যা ভাবছিলেন সেকথা লেখা থাকত। জন যখন ১৯৪৫-এ বিলেত ফিরে যান, তখন এক ধনী বন্ধু ওঁকে তাঁদের কারখানা থেকে একটা কারপেট করে দেবেন বললেন। নকশা যামিনীদা এঁকে দিয়েছিলেন—অপূর্ব একজোড়া ছুটন্ত হরিণ—সেই ছবিটি জন আমাদের উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। পরে, সেই হরিণ-ই অনেকবার এঁকেছেন—জোড়া ছেড়ে তিনটিও—ইরা-সত্যেশদের আছে। "গঙ্গার ঘাটে"র ছবি তেলরঙে এঁকেছিলেন, সেটা আমার স্বামীর পছন্দ হয় খুব, কিনে এনে-ছিলেন। নতুন মোসেইক ডিজাইনের অপূর্ব ছবি—তিনটি নর্তকী—আমার স্বামী একবার কিনেছিলেন (আমাদেরই এক বিয়ের তারিখে)—পটল এসে সেটা ভালো করে লাগিয়ে দিয়ে গেল। তখন তো নানান একসপেরিমেনট করছেন—একটা ছবি উনি এনে-ছিলেন, তেলরঙে আঁকা "ফল্টফেস", যেটার অতুলবাবু দারুণ তারিফ করতেন। জিফুর বিয়েতে দুটি ছবি উপহার দিয়েছিলেন—একটি সাদায়-কালোয় মোসেইক ডিজাইনে আঁকা বউ—আরেকটা যেটা ওরা উপহার দিয়েছে ওদের বন্ধুকে। কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছিল বলে উনি পরে আমায় কিনে দিয়ে-ছিলেন—কাঁথার মতো ডিজাইনে আঁকা "কালীয়-দমন": অপূর্ব ছবি। ভাগ্নে-বউদের দিয়েছেন—সাদা শাড়ি, লালপাড় পরনে মাথা-হেঁট-করা বড়ো ছবি—অপূর্ব। মুঙ্গেরের ভাগ্নেবউকে দিয়েছিলেন—ছেলে-কোলে বউ—অনেক কাল আগে চঞ্চলবাবু যেমন একটি কিনেছিলেন। ছোটো দিদিমণিদের অপূর্ব কটা ল্যানডস্কেপ আছে, তার মধ্যে একটা মনে হয় যেন জসিডির স্টেশনের ছবি— দিঘারিয়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে লাইনটা বেঁকে গেছে! আমার স্বামী যামিনী-দাকে সেকথা বলাতে, যামিনীদা বলেছিলেন—হতে পারে। আপনার বউদিদি যখন ওঁর বাপের বাড়ি আসতেন, দেওঘরে, আমি পৌঁছতে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছি—দৃশ্যটা সুন্দর দেখে হয়তো মনে গেঁথেছিল।

যামিনীদার আরো দুটি ছবির কথা মনে করে লিখছি। অনেকে বলেন শুনেছি যে যামিনীদার ছবিতে জীবনের ঝড়-ঝাপটার ছায়া বা প্রভাব নেই। কিন্তু জীবনের ঝড়-ঝাপটার বিলম্বিত প্রতিবিম্ব করার দায়িত্ব তো সাহিত্যের, ছবির নয়। ছবির দায়িত্ব তো মুহূর্তটিকে চিরন্তন করা—'the instant made eternity'। তবে যামিনীদার ছবিতেও নিষ্ঠুরতার নিদর্শন আছে, যদিও যীশুকে ক্রস থেকে নামানোর ছবিগুলিতে করুণা আর দুঃখ দুই আছে, বীভৎসতা তো দেখান নি—উনি ক্রুসিফিকশনের নিষ্ঠুর ছবি আঁকেন নি নিশ্চয় ইচ্ছা করেই। কিন্তু, আমাদের ঘরেই আমার স্বামী টাঙিয়ে রেখেছেন যীশুর এবং তার পাশে দুজন বন্ধু—শান্ত, সাফারি মুখের ছবি—যীশুর প্রেমের শিক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার পাশেই রেখেছেন ইংরাজ পন্টনরা ভারতীয়দের মারছে—দুটি ছবি মিলিয়ে পশ্চিমী সভ্যতার উপর কী দারুণ মন্তব্য: মুখে এক, কাজে আরেক! অতুলবাবু এবং যামিনীদার দুর্ভিক্ষের ছবিগুলি দেখে তাই করুণার কথাই মনে আসে: Oh, the pity of it!—এই সুরই বাজে যেন মনে।

যামিনীদার আরেকটা আশ্চর্য গুণের কথা আমি জানি—ওঁকে অনেক বিদেশী ভক্ত নানা দেশের, জানা এবং অপেক্ষাকৃত কম-জানা আর্টিস্টের ছবি পাঠাতেন। অজানা আর্টিস্টের ছবি যামিনীদা প্রায় নকল করে দেখতেন—এবং তৎক্ষণাৎই বলে দিতে পারতেন—তাঁদের দেশের নৈসর্গিক দৃশ্য, বা জলবায়ু কী ধরনের আর্টিস্টের রঙের আর লাইনের ব্যবহার দেখে—পাহাড়িয়া না সমতল দেশ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের

বসবাসের সুখ-সুবিধার কথা সঠিক ভাবে। যামিনীদা বলতেন কঠিন পাহাড়ে দেশ, বা নিষ্ঠুর প্রকৃতি মানুষকে কঠিন করে দেয়—তাই তার ছবির বিষয়ও কঠিন হয়ে যায়, রঙের ব্যবহারও অন্যরকম হয়।

এই সময়ে আমরা একবার দোলপূর্ণিমার পরের দিন পাঁতিহাল গিয়েছিলুম ওঁর দেশী এবং বিদেশী বন্ধুদের নিয়ে—আঁটপুর, জগৎবল্লভপুর—আরো অন্য জায়গায় মন্দিরের গায়ে কারুকার্য দেখতে। আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন যামিনীদাকে উনি যাবেন কিনা, বিশেষ আশা না নিয়েই। যামিনীদা কিন্তু রাজি হয়ে গেলেন। আমাদের সঙ্গে গেলেন, ওখানে দোলের পরের দিন থেকে কদিন মেলা বসে—যামিনীদা আমাদের সঙ্গে মেলা দেখতে গেলেন। পাঁতিহালের কাঠের পুতুল খেলনা মাত্তর কেনা হল—অবশ্য খানিকটা বিশ্রাম করার পর, ওঁদের পৈতৃক বাড়ির ঘরেতে।

যামিনীদা এই পথে গেলেন, এলেন, সারাদিন ছিলেন—কম ক্লান্তিকর নয়, কিন্তু খুবই আনন্দে ছিলেন—ক-দিন পরের দুঃসংবাদের জন্য আমরা প্রস্তুতই ছিলুম না কেউই।

কিন্তু, তার কয়েক দিন পরেই, বোধহয়, সেই সপ্তাহশেষে এক সন্ধ্যায় যামিনীদার বাড়ি থেকে ফিরে উনি গম্ভীর মুখে বললেন—'যামিনীদার শরীর খুব খারাপ—হার্নিয়া হয়েছে। অপারেশান করাতে নারাজ। খুব যন্ত্রণা—কী যে হবে!' আমিও দেখতে গেলুম যামিনীদাকে, পরের দিন। এত কষ্ট, উঠতেই পারছেন না, কাতরাচ্ছেন যন্ত্রণায়, কিন্তু অপারেশান কিছুতেই করাবেন না! দিদি, ছেলেরা সকলে, আত্মীয়-বন্ধু সকলে কত বোঝাচ্ছেন—যামিনীদাকে রাজি করানো যাচ্ছে না। আমার স্বামীর অনেকক্ষণ বসে বোঝানোর পর দেখা গেল—নিমরাজি। 'দেখা যাক, যখন প্রয়োজন হয়—এখনই তো নয়'—ইত্যাদি। তবে, কোনোমতেই উনি হাসপাতালে যাবেন না। নার্সিং হোমে? না তাও না! অপারেশন যদি করতে হয় একান্তই, তবে ওঁর এই ছোট্ট ঘরেই করতে হবে—এই পর্যন্ত উনি রাজি করাতে পেরেছিলেন। মানতে হবেই, আমাদের দেশের ডাক্তার-সার্জনরা কী দারুণ ভালো। যামিনীদার নিজের শোবার ছোট্ট ঘরটি—একটিমাত্র খাট পাতা, আর তখন বোধহয় একটি টেবিল-চেয়ারও রাখা ছিল—পাশেই খোলা ছাদ—মে মাসের গরম! কী করে কী হবে চিন্তাই করতে পারছিলুম না—খুব বিষণ্ণ চিত্তে বাড়ি ফিরেছিলুম—কেউই কোনো কথা বলতে পারছি না—মনে আছে। সেই রাত্রেই, বোধহয়, রাত বারোটা নাগাদ আমাদের বাড়িতে পটল এল—'বাবা রাজি হচ্ছেন না। ওদিকে ডাক্তাররা বলছেন অপারেশন না করলে বাঁচানো যাবে না।' সেই রাত্রে উনি গেলেন—আবার বলে-বলে, অসম্ভব ধৈর্যসহকারে, মত করালেন, সেইসব ডাক্তারি-সরঞ্জাম আনা হল—কী করে ওঁরা করলেন—আমি জানি না—অসাধ্যসাধন ওঁরা সম্ভব করলেন—মে মাসের গরমে বোধহয় যামিনীদার umbilical hernia operation successful!! ভাবতেই পারা যায় না—এমন একটি কঠিন কাজ তাঁরা সুসম্পন্ন করলেন! তবু, যামিনীদার জিদ, নানা রকমের মতামত, জানি না আর কারুর কথা ডাক্তাররা শুনতেন কি-না।

সিদ্ধ-করা মাছ বা আপেল-সিদ্ধ যামিনীদা কিছুতেই খাবেন না। শেষে ডাক্তারবাবুরাই হার মানলেন—দিদি বললেন উনি নিজে হাতে মাছের ঝোল রেঁধে দেবেন নামমাত্র তেল-হলুদ দিয়ে, তবে তো খাবার ব্যাপারের সুরাহা হল! আমাকে অপারেশানের কয়েক দিন বাদে বললেন: 'বউমা, বাজারে যাবে তো, আমার জন্য বড়ো দেখে কালোজাম এনো তো!' আমি ডাক্তারবাবুদের জিজ্ঞাসা করাতে যামিনীদা বললেন—'ও আপেল-টাপেল আমার ভালো লাগে না। আমার মুখটা তিতো হয়ে রয়েছে, আমি কালোজাম মুখে নেড়ে ফেলে দেব, গিলব না—নিজের ক্ষতি করব না। জেনো।' ডাক্তারবাবু আমায় অনুমতি দিলেন, আমি বাজারে খুব ভালো কালোজাম পেয়ে গেলুম। ভালো করে ধুয়ে যামিনীদাকে দিলুম। সত্যিই, মুখে নেড়ে রসটা খেলেন, ছিবড়েটা বার করে ফেলে দিলেন। বললেন—'বড়ো তৃপ্তি হল। যে দেশে যা, জেনো, বউমা!' কোনো ক্ষতি হয় নি।

কিন্তু এই অপারেশানের পর যামিনীদার শরীরটা ভেঙে গেল। আমার যে কতবার মনে হয়েছে এই হার্নিয়া তো ভিতরে-ভিতরে হচ্ছিল—আমরা তো জানতুম না—সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাঁতিহালে গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছি, কিছু যে হয় নি—এ যে আমাদের কী ভাগ্য! স্ট্র্যাঙ্গুলেশন হতে পারত—ডাক্তাররা পরে বললেন—আমরা না জেনে কী বিপদ টেনে আনছিলুম যামিনীদার উপর।

অপারেশানের পর বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারতেন না—তবুও, ভোরে যেমন আগে নেমে আসতেন, তেমনি কাজ করতে ছবির ঘরে নেমে আসতেন, কিছুক্ষণ বসে কাজ করে শুয়ে পড়তেন। খানিক বিশ্রামের পর আবার উঠে কাজ ধরতেন। সেইজন্যই, বোধহয়, পটল ছোট্ট দক্ষিণের ঘরে একটা ছোটো খাট পেতে বিছানার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। আমি যদি কলেজ থেকে কখনও গিয়েছি, দেখেছি, সে সময়েও বসে ছবি আঁকছেন—দু-একবার দেখেছি শুয়েছেন। আমরা যেতেই উঠে বসে, স্বাভাবিকভাবেই কথা কইতেন। সন্ধ্যায় উপরে উঠে যাবার আগে ছোটো জমির উঠানে আগের মতনই একটুক্ষণ বসতেন।

কয়েক বছর এ-রকম জীবন কাটিয়েছিলেন—কিন্তু শরীরটা উত্তরোত্তর ভাঙছিল। এক শীতে ঠাণ্ডা লেগে, ভোরে বা সন্ধ্যায়, জ্বর হয়ে গেল—সেটাই শেষ কালে নিউমোনিয়ায় পরিণত হল। প্রথমবার, বা বার দুই, জ্বর ছাড়তেই নীচে নেমে এসেছেন—তখনও আমার স্বামী গিয়ে দেখেছেন, ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছেন, রঙ-ছবির মধ্যেই। রোজই সেই সকাল বেলাতেই ধীরে-ধীরে নেমে আসতেন, ছবির মধ্যে বসতেন, কিছু কাজ করতেন, আবার শুয়ে পড়তেন। একটু বিশ্রামের পর, মনে জোর করে উঠে বসে ছবি আঁকতেন।

কিন্তু শেষে দুর্বলতা চেপে ধরল, জ্বর ছাড়ত না প্রায়ই—হাতও যেন চলে না, তারপর আর নামতে পারেন না, উপরে বিছানায় বসে বা শুয়ে থাকতেন। আমার স্বামী গিয়ে কথা বললে স্বস্তি হত—যদিও, আমি জানি, ওঁর খুব কষ্ট হত। অনেক আগেই ছবির জন্য ট্রাস্ট করতে ওঁকে ওঁর বন্ধু স্নেহাংশু আচার্যকে ডেকে ব্যবস্থা করিয়েছিলেন—নিজের জন্যও বটে, এবং পটলের তাগিদেও। এসব ব্যবস্থা করেছিলেন এই শেষ অসুখের আগেই, তাই ছবিগুলি সুরক্ষিত আছে। বোধহয় ১৩৭৮-৭৯-র ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৯৭১) যামিনীদার জন্মদিনে আমাদের যাওয়া হয় নি, তার আগের বছরও গিয়েছি,—মনে পড়ে যামিনীদা সে বছরও (১৯৭৯) যেন কষ্ট করে নীচে নেমে এসেছিলেন। অসুখটা বেশি বাড়াবাড়ি হবার আগে এক বিকেলে আমরা গিয়েছিলুম—ঠিক করেই যে, এই অসুখের সময়ে আমরা একটা ছবি কিনব। সে কথা উনি যামিনীদাকে জানালেন। কোন্ ছবি পছন্দ, জানতে চাইলেন যামিনীদা—আমার স্বামীও ঠিক করে রেখেছিলেন আগেই, তাই তক্ষুনি বললেন—"গণেশজননী"—কার্ডবোর্ডের স্ট্রিপের বুননের উপরে আঁকা—মোসেইক ডিজাইনের ব্যাকগ্রাউনড। যামিনীদা তখন পটলকে বললেন ছবিটি আনতে আর তুলিতে লাল রঙ লাগিয়ে এনে ওঁর হাতে দিতে—বিছানায় উঠে বসে, কাঁপা হাতে নিজে "যামিনী রায়" সইটি করে আমার হাতে ছবিটি দিয়ে, বললেন: 'বউমা, পছন্দ?' আমার চোখ জলে ভরে যায় এখনও। কথাগুলিও যেন কানে বাজে!

তারপর আরেকদিন গিয়েছিলুম—দিদি, পটল, পঞ্চানন আর একটি নার্সও ছিলেন। তখন যামিনীদা করুণভাবে হাত দুটি তুলে কী যেন চাইছিলেন। হাত তোলা দেখে বুঝতে পারছিলুম না, আমরা কেউই—যামিনীদা কী যেন চাইছেন। নার্সই বলে দিলেন

আমার স্বামীকে 'বাবু, আপনি কাছে আসুন,—বাবুর কাছে,—উনি আপনাকে কাছে চাইছেন।' ধীরে-ধীরে, দেখলুম, হাত দুটি কাঁপতে-কাঁপতে তুললেন, আস্তে ওঁর গালের উপর হাত দুটি বুলিয়ে দিলেন—এখনও সে দৃশ্য স্মরণে এলে চোখের জল বন্ধ করা যায় না। আরেক দিন সকালের দিকে গিয়েছিলুম—১০টা-১১টার সময়ে। তখন যামিনীদার ঘরে সবাই ওঁর "স্পনজিঙে"র ব্যবস্থা করছিলেন। ওঁর নাম শুনেই যামিনীদা তক্ষনি বললেন—ভিতরে ডাকো। আমি দেখলুম, তখনই, কী পরামর্শ হচ্ছে, মুখের বাঁ দিকটা ফুলে গেছে। আমিই, পরে, বাইরে এসে আমার স্বামীকে চুপি-চুপি সে কথাটি বললুম। দিদি বললেন, 'জানি! আমরা অনেক রকম করে ডান দিকে ফিরিয়ে শোয়াতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই উনি ডানদিকে শোবেন না।' তক্ষুনি, আমার স্বামী বলে উঠলেন ডান হাতটাতো ছবির হাত—যে করেই হোক সে হাতটা বাঁচাতে হবে—তাই আপনাদের শত চেষ্টা ব্যর্থ করে বাঁয়ে ফিরে শোবেনই। হার্টে স্ট্রেন পড়ে, তাই বাঁ-দিক ফুলে যায়!' আমি বুঝলুম—এই অন্তিম কালেও নিজের শরীরের সমস্ত কষ্ট জলাঞ্জলি দিয়েও—মাথায় একটিমাত্র চিন্তা ছবি! আর আমি আমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বুঝলুম—যামিনীদার মনের কথাটি উনি যেন ঠিক বুঝলেন তক্ষনি! মানুষে মানুষে কী ভাবে একাত্ম হতে পারে, একথাটি স্পষ্ট বুঝলুম।

১৯৭২ সালে ২৪শে এপ্রিল যামিনীদা চলে গেলেন! সেইদিনই বোধহয় কয় শতক বছর আগে শেক্‌সপিয়র জন্মেছিলেন। ১৯৬৬ সালে, ৬ বছর আগে, সেদিনটি, কত ভালো দিন মনে করেই আমি ব্যবস্থা করেছিলুম—আমাদের ঘরে বসে জিষ্ণু-মীরার বিয়ের registration certificate-এ যামিনীদা ও সত্যেন-বাবু সই করেছিলেন। সবই যেন ভেল্কি, ফাঁকি—মনে হয়, এখন!

২৩শে এপ্রিল, বেশি রাতে, আমার স্বামী একটি সনেট লিখেছিলেন। আমায় বলেছিলেন—যামিনীদার কথা মনে হচ্ছিল। সাধারণত বেশি রাত্রে, বা রাত জেগে কবিতা লিখতেন না। এ কবিতাটি নিশ্চয়ই মনের কোনো বিশেষ তাগিদেই লিখেছিলেন। কবিতাটির শেষে দুটি লাইন :

কর্মকীর্তি অফুরন্ত, নিত্য ধ্যানে বোনা।
জানালা খোলা চারদিকেই, দরাজ আজ কপাট ॥

২৩।৪।৭২

( ঈশাবাস্য দিবানিশা। )

আমার জীবনটা ধন্য—আমি এরকম লোকের সংস্পর্শে আসতে পেয়েছি।

রচনাকাল : ১৯৮৮

প্রণতি দে কবি বিষ্ণু দে-র পত্নী। তাঁর এই রচনাটির শেষাংশ প্রকাশিত হল শিল্পীর ১০৪-তম জন্মবার্ষিকী এবং উনবিংশ মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণে ( শিল্পীর জন্ম : ১১ এপ্রিল, ১৮৮৭, মৃত্যু : ২৪ এপ্রিল, ১৯৭২ )।



# ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র ও জনপ্রতিনিধিত্বের স্বরূপ

পুলকনারায়ণ ধর

গণতন্ত্র শব্দটি আজ প্রায় কারুর কাছেই অপরিচিত নয়। একথা হয়তো সাহস করে বলা গেলেও "গণতান্ত্রিক" চিন্তাভাবনা আর তার অর্থ ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যার সকলের কাছেই পরিষ্কার কিনা, সে সম্বন্ধে হলপ করে কোনো কথা বলা শক্ত। শ্রেণী, বর্ণ, গোষ্ঠী ও নানা কৌমে বিভক্ত ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে বিভিন্ন ধর্মের তথা ক্ষেত্রের মানুষের কাছে গণতন্ত্রের অর্থও ভিন্ন-ভিন্ন। ভারতের সংবিধানে যে-সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেই অধিকারগুলো সম্বন্ধে বেশির ভাগ মানুষের কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু অল্প কিছু মানুষ সামাজিক তথা আর্থিক প্রতিপত্তির জোরে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারগুলি এবং গণতান্ত্রিক সুবিধাগুলি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করতে পারে। যেহেতু সংবিধানের এই সুযোগগুলি তারা কাজে লাগাতে পারে, সেই কারণে জনগণের বিপুল অংশের ওপর তারা তাদের আধিপত্য এবং শক্তিও বাড়িয়ে তুলতে পারছে।

গণতন্ত্র জীবনবিন্যাস সম্পর্কে একটি ধারণা—যে ধারণা বুর্জোয়া সমাজের ঊষাকালেই জন্মলাভ করেছে, এবং স্বাধীন জীবনযাত্রার পাথেয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু "গণতন্ত্র"কে ক্ষুদ্রতর অর্থে ব্যবহার করতে-করতে আমরা এর প্রকৃত তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছি। "গণতন্ত্র" বলতে সাধারণভাবে আমরা শুধু বুঝি—'ভোট' বা 'নির্বাচন'—অর্থাৎ 'মাথা গোনা'।

বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অনেকেই তিনটি বিন্যাসে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকায় দেখা যায় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা; সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ইত্যাদি দেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের নির্বাচনব্যবস্থা, এবং লাতিন আমেরিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা। এই তিনটি ব্যবস্থার কোনোটিই আমরা প্রকৃত অর্থে পূর্ণমাত্রায় ভারতে দেখি না। এখানে সোভিয়েত কিংবা চীনা-ধাঁচের ব্যবস্থা একেবারেই নেই। ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থার আভাস এখানকার সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি

সত্ত্বেও মাঝে-মাঝে দেখা যায়।

এই অবস্থার জন্য রাজনৈতিক কারণের চেয়ে আমাদের জাতপাতধর্মভিত্তিক সমাজের গঠন এবং আর্থিক বিকাশব্যবস্থাই বেশি দায়ী। তাই ব্যারিংটন মুর প্রমুখ পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীরা ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিশেষ কোনো পর্যায়ের অন্তর্গত না করে 'hybrid character' বলে চিহ্নিত করেছেন।

পরাধীন ভারতেও কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি শীর্ণ কাঠামো ছিল। স্বায়ত্তশাসন, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ব্রিটিশ-ঔপনিবেশিক শাসকরা সীমিতভাবে এখানে চালু করেছিল। সেখানে স্থান লাভ করবার জন্য বাবু আর জমিদারদের মধ্যে, এবং পরবর্তী কালে হিন্দু মুসলমান উচ্চবর্গের মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব আর ঘোঁট পাকানোর রাজনীতি চলত। ১৮৫৭ সালের মহা-বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা খুব সন্তর্পণে "শ্বেত মানবের বোঝা" (white man's burden) হিসাবে জনগণের প্রকৃত "প্রতিনিধি" তৈরি করার কলকব্জা আমদানি করতে শুরু করে। পাশ্চাত্যের মডেলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ভারতের মাটিতে রোপণ করে, এবং গ্রাম-ভিত্তিক পঞ্চায়েতি গণতান্ত্রিক কাঠামো জীর্ণ হয়ে আসে।

স্বাধীনতার পর 'কনস্টিটুয়েনট অ্যাসেমব্লি' মারফত আমরা আমাদের সংবিধান রচনা করি। এই অ্যাসেমব্লির সভ্যরা সকলেই ছিলেন খুঁজেপেতে-পাওয়া শাসকশ্রেণীর পছন্দসই লোকজন। এঁদের কেউই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচন না করেও জন-প্রতিনিধি পাওয়া সম্ভব, এবং তারই জোরে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হচ্ছে 'We, the people of India' (আমরা, ভারতের জনগণ) এই সংবিধানের প্রণেতা।

নির্বাচন এড়িয়ে যাওয়া আমাদের সংবিধান-প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল না। নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিধি সংবিধানের পাতায়-পাতায় উল্লিখিত। কারণ, নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁদের হারাবার কিছুই ছিল না। একটি আধা সামন্ততান্ত্রিক জাতপাতধর্মভিত্তিক সমাজে ওয়েস্টমিনস্টার মডেলের শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন পবিত্র বস্তু। নির্বাচন মানেই দল, এবং ভারতে দল মানেই বোঝাত কংগ্রেসকে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ঐতিহাসিক কারণেই জাতীয় কংগ্রেসের আধিপত্য অবিসংবাদিতভাবেপ্রতিষ্ঠিতহয়। কংগ্রেসের বয়স আজ একশ বছরের বেশি, কিন্তু ভারতীয় রাজ-নীতিতে কংগ্রেসের প্রকৃত বিকল্পের অনুসন্ধান আজও শেষ হয় নি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের বিরোধিতা কংগ্রেসকে টুকরো করেই হয়ে এসেছে। সুতরাং, ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসবিরোধী "দল" কখনও ক্ষমতায় অল্প সময়ের জন্য আসীন হলেও তারা মূলত কংগ্রেসি, এবং এর ফলে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় নি। কংগ্রেসের এই একাধিপত্য বিচার করে অনেকেই ভারতীয় দল-প্রথাকে "একদলব্যবস্থা" বা "একদলীয় ব্যবস্থা" বলে অভিহিত করেছেন। এদিকে আবার ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা বিচার করলে দেখা যায় : এই বিশাল দেশে কংগ্রেসের মতো একটি বিপুলবপু দলের স্তরে-স্তরে নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো কখনই তৈরি হয় নি। তাই কখনও গান্ধীজীর, কখনও নেহরুর, আবার কখনও ইন্দিরা গান্ধীর 'ক্যারিস্মা' দিয়ে পার্টি চালাতে হয়েছে।

### ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি

সংসদীয় কাঠামোর মধ্যেই তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজ-নীতির পরিকাঠামো তৈরি হল। রাজা আর জমিদারের দেশ ভারতবর্ষের সরল মানুষের মানসিকতার সঙ্গে তা খুব বেমানানও হল না। বাম, দক্ষিণ অন্যান্য দলও আজ মোটামুটি সে পথেই চলেছে। কংগ্রেসকে বাদ





দিলে অন্যান্য যে-সমস্ত সর্বভারতীয় দল আছে, ভৌগোলিকভাবে তাদের তেমন কোনো ব্যাপ্তি নেই। সম্প্রতি ভারতীয় জনতা পার্টি (বি. জে. পি) দেশের বহু জায়গায় তার সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আদর্শের পরিবর্তে ধর্ম আর জাতপাতের ভিত্তিতে রাজনীতি সম্বল করে গঠিত বহু ছোটো-বড়ো দল—উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে। আজ ভারতের রাজনীতির ময়দানে অগণিত দল এবং নির্দল প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বন্দ্বযুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। এখন রাজনীতির পট দ্রুত পালটায়। রাজনৈতিক পলটনরাও বারবার ফিরে আসে জনগণের কাছে করজোড়ে ভোটের আশায়।

১৯৫২ সালে ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর আজ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আর কেন্দ্রে অসংখ্যবার নির্বাচন-উপনির্বাচন হয়ে গেছে। দশম লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই মে মাসেই। নবম লোকসভার নির্বাচন হয়েছিল ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে। এই পরি-প্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে—বার-বার নির্বাচনের বোধন করে গণতন্ত্রের ভিত্তি কি দৃঢ় হচ্ছে? সত্যিকারের জনমত কি এতে প্রতিফলিত হচ্ছে?

ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি এবং সাংসদদের কার্যকলাপ আর আচার-আচরণ সংসদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাভক্তি বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি করে নি। ভোট বা নির্বাচনে জনগণের সর্বস্তরের উৎসাহ কোনো দিনই দেখা যায় নি। নির্বাচকমণ্ডলীর কমবেশি শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ নির্বাচনে যোগই দেয় না, এবং যারা দেয় তাদের একটা বিরাট অংশ দলীয়-স্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ কিংবা ধর্মীয় স্বার্থবোধ দ্বারা পরি-চালিত হয়ে ভোট দেয়। এ ছাড়া, নির্বাচনের আগে কাড়া-নাকাড়ার শব্দে চারিদিকে একটা উন্মত্ত ঘোরের সৃষ্টি হয়। এই 'নির্বাচনে'র বিজ্ঞাপনও জন-গণকে আকৃষ্ট করে। তখন ভোটারদের অনেকেই ভাবতে শুরু করেন তাঁরাই 'দেব'। এসব দেখে মনে হয়, ভোট সম্বন্ধে কোনো-কোনো স্তরের ভোট-দাতাদের বিতৃষ্ণা যতই থাক, বা বিশ্বাস যতই শিথিল হয়ে আসুক না কেন, তা সামগ্রিকভাবে ভোট-বয়কটের রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয় নি।

এই ভোট-বয়কটের আহ্বান কিন্তু রাজনৈতিক পর্যায়ে ওঠে সাতের দশকে সি. পি. আই (এম-এল) পার্টির নেতৃত্বে। ভারতরাষ্ট্রের শ্রেণীকাঠামো বিচার করে তাঁদের মনে হয়েছিল ভোটের রাজনীতি বিপ্লবী উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তাই তাঁরা ভোট-বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু সে আহ্বানে সাড়া মেলে নি। তাঁদের আন্দোলনের লক্ষ্য ও আহ্বান ব্যর্থ হলেও একটি মৌলিক প্রশ্ন তাঁরা তুলে এনেছিলেন। এই মৌলিক প্রশ্নটি হল—নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিরা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি কিনা। বর্তমান নির্বাচনের মাধ্যমে 'জনমত' কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে—এ সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা শুরু হয়েছে। নির্বাচনে ভোট দিয়েও মানুষের মনে এই জিজ্ঞাসাটা এসেছে। এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার আগে একবার ভারতের নির্বাচন-ইতিহাসের মানচিত্রটার দিকে তাকানো যেতে পারে।

প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। ১৭ কোটি ৬০ লক্ষ ভোটদাতা এতে যোগদান করেন। ৯০,০০০ ভোটকেন্দ্র এবং ২২,৪০০০ ভোট-বুথ তৈরি করতে হয়েছিল। ব্যালটপেপার ব্যবহৃত হয়েছিল ৬২০,০০০,০০০। খরচ হয়েছিল ৭০০,০০০ টাকা। লোকসভার ৪৮৫টি আসনের জন্য ১,৮০০ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের বিধান-সভার ৩,২৮৩টি আসনের জন্য ১৫,০০০ জন প্রার্থী ছিলেন।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ৪৫% ভোট পেয়ে ৩৬৪টি আসন লাভ করে। অর্থাৎ মোট ভোট-দাতার অর্ধেকেরও অনেক কম ভোট পেয়ে 'বিপুল-ভাবে' জয়ী হয়ে আসে।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫৭) ভোটদাতার

সংখ্যা ছিল ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ। কংগ্রেস মাত্র ৫৭,৫৭৯,৫৯৩ ভোট পেয়ে ৪৯০টি আসনের মধ্যে (লোকসভায়) ৩৭১টি আসন লাভ করে। ভোটারের মোট সংখ্যা ছিল ১২০,৫১৩,৯১৫।

### কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্যে ভাঙন

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনেও (১৯৬২) অবস্থা মোটামুটি একইরকম ছিল। কিন্তু ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে একটা বড়ো পরিবর্তন দেখা গেল। লোকসভায় কংগ্রেসের আসনসংখ্যা কমে হল ২৮৩। বিহার, কেরালা, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পানজাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবাঙলায় কংগ্রেস পর্যুদস্ত হল। লোকসভায় আর বিভিন্ন রাজ্যে স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ও আঞ্চলিক দলগুলি তাদের শক্তিবৃদ্ধি করল। ইতিমধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে তৈরি হল সি. পি. আই. ও সি. পি. আই (এম)। ভারতীয় দলপ্রথায় এই প্রথম মনে হল—'একক দলের আধিপত্যে'র গৌরব কংগ্রেসের ম্লান হয়ে এল। শুরু হল ভাঙনের রাজনীতি।

১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দল দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। লোকসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। সুতরাং ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭০-এ লোকসভা ভেঙে দেওয়া হল এবং ১৯৭১-এর মে মাসে অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। ভেঙে-দেওয়া লোকসভায় কংগ্রেস (ই)-র আসনসংখ্যা ছিল ২২৮। নবগঠিত লোকসভায় তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫০।

১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল হয় চমকপ্রদ। কংগ্রেস এইবারই প্রথম কেন্দ্রে ক্ষমতাচ্যুত হয়। তার জায়গায় আসে নবগঠিত জনতা পার্টি। উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি ভারতের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেই উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস লোকসভার ৮৫টি আসনের মধ্যে একটিও লাভ করতে পারে নি। লোকসভার মোট ৫৪২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেল মাত্র ১৫২টি আসন।

কিন্তু মাত্র আড়াই বছর পরে ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত হল সপ্তম লোকসভার নির্বাচন। বোঝা গেল, জনমতের বা ভোটদাতাদের মতের জোরে সংসদ টিকে থাকে না। জনগণ কি তাঁদের প্রতিনিধিদের মাত্র আড়াই বছরের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন? জনপ্রতিনিধিরা তা হলে কতখানি জনপ্রতিনিধি?

সপ্তম লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) আবার ক্ষমতায় ফিরে এল। এবার তারা পেল ১৯৭১ সালের চেয়েও বেশি আসন (৩৫১)। জনতার আসনসংখ্যা ২১৭ থেকে কমে দাঁড়াল মাত্র ৩২। কেবল দুই কমিউনিস্ট পার্টির আসনসংখ্যার বিশেষ হেরফের হয় নি। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় কংগ্রেসের আসন ৪৬ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৩০৬টিতে এবং জনতার আসনসংখ্যা ৩৫০ থেকে কমে হল মাত্র ৪টি। লোকসভায় উত্তরপ্রদেশ থেকে জনতা লাভ করে মাত্র ৩টি আসন। কংগ্রেস লোকসভার ৩৫১টি আসন পেয়েছিল মাত্র ৪২·৭% ভোট পেয়ে। জনতা লাভ করে ৩২টি আসন ৮·৬% ভোট পেয়ে। সি. পি. আই (এম) শতকরা হিসাবে জনতার চেয়ে কম ভোট লাভ করেও (৬%) আপন পায় ৩৫টি।

১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যার পর অষ্টম লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই বছরেই ২৪ ডিসেম্বর। কংগ্রেস বিপুলসংখ্যক আসন লাভ করে (৪০১)। এখানে লক্ষণীয় যে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে যে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কংগ্রেস ৪২টির মধ্যে ৪১টি আসন লাভ করেছিল, সেই প্রদেশে এইবার তার আসনসংখ্যা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৬টিতে। আবার পশ্চিমবঙ্গে তা বেড়ে দাঁড়াল ৪ থেকে ১৬টিতে।

### খেলা ভাঙার খেলা

১৯৮৯-এর নভেম্বরে নবম লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। কংগ্রেস এককভাবে সর্ববৃহৎ দল হিসাবে জিতে এলেও (১৯৪ আসন), জনতাদল বামফ্রন্ট এবং বি. জে. পি-র সমর্থনে সরকার গঠন করে। জনতাদল পেয়েছিল মাত্র ১৩১টি আসন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই জনতাদল বিভক্ত হয়ে গেলে এবং বি. জে. পি. সমর্থন তুলে নিলে নতুন সরকারের পতন হয় এবং মাত্র ৫৪ জন সমর্থক নিয়ে জনতা (স) চন্দ্র শেখরের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জনমত বা ভোটদাতাদের কি কোনো সম্পর্ক ছিল? এবং এই নতুন সরকারও ৬ই মার্চ ১৯৯১ পদত্যাগ করতে বাধ্য হল কংগ্রেসের অসহযোগিতার কারণে। এই প্রক্রিয়াতেও জনমতের বা ভোটদাতাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সমস্তটাই ছিল খেলা ভাঙার খেলা।

### ভোটসর্বস্ব রাজনীতির কলাকৌশল

ভোটসর্বস্ব রাজনীতির একটা নিজস্ব নিয়ম বা ধারা আছে। ভোট জেতার একটা কৌশল আছে। যার কৌশলী বুদ্ধি যত বেশি, তার ভোট সংগ্রহ করবার ক্ষমতাও তত বেশি। এখানে নীতি নয়—কৌশলই বেশি ক্রিয়াশীল। মিথ্যা বলা, প্রবঞ্চনা করা, ভয় দেখানো, জাল ভোটার সংগ্রহ করা, ঘুষ দেওয়া, বুথ দখল করা, ভোটার লিস্টে ভুয়া নাম তোলা এবং প্রকৃত ভোটারদের নাম বাতিল করা, প্রশাসনযন্ত্রকে দলীয় কাজে ব্যবহার করা—এইরকম নানা পদ্ধতিতে ভোট-সংগ্রহের যুদ্ধ করতে হয়। এগুলো আজ প্রায় ভারতের সর্বত্র অলিখিত পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত।

ড. বিধানচন্দ্র রায় একবার বলেছিলেন :

If I hate anything in public life it is the creation of political sectors or groups for the sake of controlling public opinion. I am convinced that this universally practised political manoeuverlng cannot lead to the greatest good of the greatest number, and abuses, nepotism and dishonesty follow.[২]

ভারতের এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের অসংখ্য নির্বাচন আজ বিধানচন্দ্র রায়ের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছে। বহু মানুষ নির্বাচনে যোগ দিয়েও নির্বাচন সম্পর্কে কোনো মোহ পোষণ করে না। দল, উপদল, চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (pressure groups) ও স্বার্থগোষ্ঠী (interest groups) আমাদের রাজনীতি ও দলগুলিকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে দলগুলি জনগণের স্বার্থরক্ষার চেয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৌলিক প্রশ্ন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে, জনগণকে বিভক্ত করে এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে শোরগোল তোলে যাতে মূল সমস্যা ধামাচাপা পড়ে। তাই দেখা গেল, দেশে যখন জাতের সংঘাত আর সাম্প্রদায়িক সমস্যা ছড়াচ্ছে, দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগামী, দেশের ঐক্য বিপন্ন, তখন একের পর এক সরকার ভাঙছে এবং কোটি-কোটি টাকা অর্থব্যয়ে রাজ্যে-রাজ্যে এবং সারা দেশে নির্বাচন চলছে, অর্থাৎ খোঁজা হচ্ছে "জনপ্রতিনিধি"। আসলে, রাজনৈতিক নেতারা ও দলগুলি তাঁদের মনের মতন করে ঘর সাজাবার জন্য বারবার জনগণের দোহাই পাড়েন। এঁরা কি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বা প্রকৃত প্রতিনিধি হতে পারেন? এই প্রশ্ন স্বাভাবিক।

নির্বাচনে সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রয়োজন অর্থবল আর বাহুবল। এবং এই নির্বাচনকে সুষমামণ্ডিত করার জন্য প্রয়োজন জনগণের (অর্থাৎ কিছু ভোটারের) স্বীকৃতি। ভারতের অর্থনীতিতে সমান্তরালভাবে আরেকটি আর্থব্যবস্থা সতত চলমান। সেটি হচ্ছে অদৃশ্য অথচ অমোঘ কালো টাকা। এই কালো টাকা নির্বাচনের সময় বিপুল গতি সঞ্চয় করে। কালো টাকার আড়তদাররা নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দলের পাশে এসে দাঁড়ায়—কোথাও 'গমের লবি' বা 'চিনির লবি', কোথাও 'তুলোর লবি' বা 'তেলের লবি' সক্রিয় হয়ে ওঠে। জনমত আর দল-

মতকে এই সমস্ত লবি প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়। সুতরাং নির্বাচনকে সংগঠিত করতে অর্থাৎ সংগঠকদের সংগঠিত করতে এদের ভূমিকা এবং এদের হাতের বড়ো-বড়ো সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা ব্যাপক আর গভীর।

সুতরাং জনমত বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, সেই মত জনসাধারণের মধ্য থেকে গঠিত হলেও তা মূলত বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী ও লবির মতামতকেই প্রতিফলিত করে সীমিত ও নির্দিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে। নির্বাচনের সময় রেডিয়ো, টিভি, সংবাদপত্র ও প্রচারের ছয়লাপে গোটা দেশটা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক দলগুলির (বিভিন্ন লবির বকলমে) "টিউটরিয়াল ক্লাস"। জনগণ স্বাধীনভাবে ও স্বকীয় পদ্ধতিতে নিজস্ব মতামত গড়ে তুলবার অবকাশই পান না। জনগণ কার্যত অন্য সময়ের চেয়ে নির্বাচনের সময় অনেক বেশি বিভ্রান্তির শিকার হন।

নির্বাচনের লড়াই কদাচিৎ আদর্শগত ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেখানে তফশিলি জাতি আর উপজাতিদের আর্থ-সামাজিক সাম্য ও উন্নতির আদর্শ প্রচার করে লড়াই, সেখানে সর্বশেষ বিচারে দেখা যাবে ভোটের অঙ্কের (ভাগ-বাঁটোয়ারা) হিসেব কষেই এইরকম একটা আদর্শ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। আবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ হয়তো সংখ্যালঘুদের মন থেকে ভয়ভীতি দূর করে তাদের কাছাকাছি পৌঁছোবার চেষ্টা। এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আদর্শের জন্য নয়—ভোটের অঙ্ক কষেই দলগুলি এসব করে। নতুবা কয়েক যুগ ধরে যাঁরা দেশের বিভিন্ন দলের নেতা, তাঁরা ক্ষমতায় থাকুন বা না থাকুন, এই সমস্যাগুলিকে তাঁরা কোনো প্রাধিকার দেন নি কেন? এই সমস্যা সম্বন্ধে তাঁদের গঠনমূলক চিন্তাভাবনাই বা কী? আরও আশ্চর্য লাগে যে, এঁরা সবাই হয় ধর্ম নয়তো জাতপাতের ভিত্তিতে বিশেষ-বিশেষ স্থানে দলীয় প্রার্থী মনোনীত করেন। কখনও-কখনও সাম্প্রদায়িক দল বা ইমাম-মোল্লা ও মোহন্তদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসেন। এ সবই ভোটের জন্য। আদর্শের জন্য নয়। নির্বাচন ম্যানিফেস্টো তোলা থাকে কুলুঙ্গিতে। ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের এটা একটা ধারা।

এই অবস্থায় জনগণ যখন তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন, তা কোনো আদর্শভিত্তিক হতে পারে না। সুতরাং ভারতের নির্বাচনগুলিতে নীতিভিত্তিক কোনো বিশেষ ধারা বা প্যাটার্ন গড়ে ওঠে নি। তাই অতি অল্প সময়ের ব্যবধানেই ভোটবাক্সে চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। এ থেকে মাথাগুনতি গণতন্ত্রের ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত গণতান্ত্রিক বোধের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল জনগণের সার্বিক প্রতিনিধিত্ব। অঙ্কের হিসেবেই এই প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই হিসেবে ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব সর্বদা জনগণের সংখ্যা-গরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব নাও হতে পারে। মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা ও মোট ভোটদাতাদের পার্থক্য বিচার করলেই তা বোঝা যাবে। তা ছাড়া, ভোটদাতাদের মধ্যে প্রায়-অর্ধেক ভোটদানে বিরত থাকেন এবং একটা বিরাট অংশের ভোট অবৈধ বলে বাতিল হয়ে যায়।[৩] সুতরাং জনপ্রতিনিধি হিসাবে যিনি নির্বাচিত হচ্ছেন তিনি প্রকৃতপক্ষে অল্প কিছু লোকের ভোটেই নির্বাচিত হচ্ছেন। এটাই বেশির ভাগ প্রার্থীর ক্ষেত্রে ঘটে। যে প্রার্থী সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হলেন, দেখা যায়, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পাল্লার সমবেত ভোটের সংখ্যা তাঁর (জয়ী প্রার্থীরই) প্রাপ্ত ভোটের চেয়ে অনেক বেশি। এর নজির অজস্র।[৪] অর্থাৎ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বাস্তবে সেই অঞ্চলের বেশির ভাগ জনগণের প্রতিনিধি হতে পারেন নি। তিনি কেবল দলীয় প্রতিনিধি হিসাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ফলে, সাধারণ ভোটারদের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে।

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের আরেকটি অদ্ভুত চরিত্র





আছে। এখানে কেন্দ্রে লোকসভায় যদি কোনো দল বিপুল ভোটে জিতে আসে—তখন ধরে নেওয়া হয় যে-যে রাজ্যে সেই বিজয়ী দলের 'সরকার' নেই সেই-সব সরকারের ক্ষমতায় টিকে থাকার আর কোনো অধিকার নেই। লোকসভার রায়ে বিধানসভাগুলি বাতিল বলে ব্যাখ্যা করা হয়, এবং সরকারকে বরখাস্ত করা হয়।

১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতায় এসে কংগ্রেসশাসিত রাজ্যসরকারগুলিকে একসঙ্গে ভেঙে দিয়ে এক নজির সৃষ্টি করেছিল। আবার ১৯৮০ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে অনুরূপভাবে অকংগ্রেসি-দল-শাসিত নয়টি রাজ্যসরকারকে (উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাত, পানজাব, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র) বাতিল করে দিল।

১৯৮৯ সালের নভেম্বরে জনতা পার্টি ও অন্যান্যরা ক্ষমতা দখল করেই বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালদের একসঙ্গে বরখাস্ত করতে শুরু করে। কংগ্রেসশাসিত রাজ্যসরকারগুলিকে বাতিল করার ক্ষমতা তখনও নতুন সরকার অর্জন করতে পারে নি। লোকসভায় যে দল বিজয়ী হয়ে আসে, সেই দল মনে করে—রাজ্যবিধানসভায় নির্বাচিত সরকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। অথচ দুই ক্ষেত্রে জনমত দুভাবে ও দুই পর্যায়ে নির্ধারিত হয়ে আসছে। সুতরাং জনপ্রতিনিধিত্ব নীতির প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের 'রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে' (political culture) নেই বললে চলে।

চিন্তাবিদ্ জন স্টুয়ার্ট মিল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসিত সরকারকে সুবিধাভোগীদের সরকার বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এরাই বাস্তবে রাষ্ট্রের একমাত্র কণ্ঠস্বর। তাঁর মতে,

'This is the inevitable consequence of the manner in which the votes are now taken, to the complete disfranchisement of minorities.'[৫]

অর্থাৎ এই ভোটব্যবস্থায় 'সংখ্যালঘু' ভোটদাতাদের বাস্তবে ভোটাধিকারের কোনো মূল্য থাকছে না।

স্টুয়ার্ট মিল সমাধানসূত্র হিসাবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কথা উল্লেখ করে বলেছেন :

'In a really equal democracy, every or any section would be represented, not disproportionately, but proportionately. ...Man for man, they would be as fully represented as the majority. ...In a false democracy which, instead of giving representation to all, gives it only to the local majorities, the voice of the instructed minority may have no organs at all in the representative body'.[৬]

অর্থাৎ সংখ্যালঘু ভোটারদের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকলে গণতান্ত্রিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের আধিপত্য হবে ভুয়া গণতন্ত্রের ভিত্তি।

**সূত্রনির্দেশ ও টীকা**

১. নির্বাচন বছর—১৯৫২ ১৯৫৭ ১৯৬২ ১৯৬৭ ১৯৭১ ১৯৭৭ ১৯৮০ ১৯৮৪ ১৯৮৯

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্বীকৃত দল— | ৫১ | ৪৬ | ৪৩ | ৪৫ | ৪৭ | ২৩ | ৩২ | ৩২ |
| প্রতিনিধিত্ব (লোকসভায়) | ২০ | ১৮ | ২৩ | ২২ | ২০ | ১৫ | ১৭ | ১৯ |

১৯৯১ দশম লোকসভা নির্বাচনে স্বীকৃত দলের সংখ্যা ৪০।

২. *Dr. B. C. Roy*—by K. P. Thomas, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ ১৮৯।

*The Crisis of India*—by Ronald Segal, পৃ ২৪৪।

৩. কংগ্রেসের জয়ের হিসাব। নির্বাচকমণ্ডলীর অনুপাতে প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হিসাব।

| ১৯৫২ | ১৯৫৭ | ১৯৬২ | ১৯৬৭ | ১৯৭১ |
|---|---|---|---|---|
| ২৭·৫২ | ২৮·৭০ | ২৩·৮৬ | ২৩·৫১ | ২৩·৩৪ |

বৈধ ভোটের তুলনায় প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হিসাব :

| ৪৪·৩৯ | ৪৭·৭৮ | ৪৪·৭৩ | ৪০·৮২ | ৪৩·৬০ |
|---|---|---|---|---|

লোকসভায় প্রাপ্ত আসনের শতকরা হিসাব :

| ৭৪·৪৪ | ৭৫·১০ | ৭৩·০৮ | ৫৪·০৮ | ৬৭·৯৫ |
|---|---|---|---|---|

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ৩,০০৯,৪৯৮ সংখ্যক ভোট অবৈধ বলে বাতিল হয়ে যায়। এই সংখ্যা সমগ্র আসাম বা দিল্লী, মণিপুর, হিমাচলপ্রদেশ, ত্রিপুরার সমবেত ভোটদাতার সংখ্যার চেয়েও বেশি।

১৯৭৭ সালের লোকসভায় অবৈধ ভোটের সংখ্যা ৫,৩০৭,৬১০, গোটা উড়িষ্যা রাজ্যের বৈধ ভোটের চেয়ে বেশি, বা কেন্দ্রশাসিত ৯টি রাজ্য ও হিমাচলপ্রদেশের সম্মিলিত ভোটদাতার সংখ্যার চেয়েও বেশি। পরবর্তী নির্বাচনগুলিতেও এই ধারার পরিবর্তন ঘটে নি।

৪. ১৯৭১ সালের লোকসভায় ৫১৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ৩৫৪ সদস্য বৈধ ভোটের শতকরা ৫০ ভাগের বেশি পেয়েছেন। সমগ্র ভোটদাতাদের সংখ্যার হিসাবে যা আরও কম। ১০ জন সদস্য বৈধ ভোটের ৩০% কম ভোট পেয়ে সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন। রাজ্য-বিধানসভাগুলিতে এর নজির আরও বেশি। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিরাট ঐতিহাসিক পরাজয় ঘটল। সে সময়ের দু-একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক।

কলকাতা রাজনীতি প্রবণ শহর বলে পরিচিত। সে সময় কলকাতার মোট ভোটার ছিল ২১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৩২ জন। কিন্তু ভোটবাক্সে মতামত জানা গেল ১০ লক্ষ ২২ হাজার ৯০৫ জনের। এর মধ্যে 'ব-কলম' ভোটারের (false voter) সংখ্যা অবশ্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

কলকাতার মোট ২২টি আসনের মধ্যে ২১টি আসনের জয়ী প্রার্থীরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সম্মিলিত ভোটের চেয়ে কম ভোট পেয়েছেন। অর্থাৎ মোট বৈধ ভোটের বেশির ভাগ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যেমন, রাসবিহারী অঞ্চলে সি. পি. আই (এম) প্রার্থী ১০ হাজারেরও কম ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন।

আবার বালিগঞ্জ অঞ্চলে সি. পি. আই (এম) প্রার্থী ৬ হাজারেরও কম ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। ঢাকুরিয়া কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থী ১ হাজারের ওপর কম ভোট পেয়েও জয়ী হয়েছেন। অর্থাৎ এইসব অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে না।

আবার পশ্চিম দিনাজপুরের ইটাহার কেন্দ্রটিতে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস প্রার্থী প্রায় ২৩ হাজারের ওপর কম ভোট পেয়েও জয়ী হয়েছেন। অন্যান্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও মোটামুটি একই ছবি পাওয়া যাবে।

(—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা—১৯৭৭ জেলাভিত্তিক বিশ্লেষণ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) প্রকাশিত পুস্তিকা।)

৫. *Representative Government*—John Stuart Mill, World Classics (Ed), London, 1963, p 249.

৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৯।

লেখক পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-পরিষেবায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে কর্মরত।
বর্তমানে চন্দননগর সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করছেন।



## প্রতিবেশী সমাজ-সংস্কৃতি

# ভোটযুদ্ধে দেওয়াল-লিখন : বাংলাদেশ

আবদুস সামাদ গায়েন

সেকালে রাজায়-রাজায় যুদ্ধের সূচনা ঘটত শিঙ্গা, ভেরী বাজিয়ে। একালে ভোটপর্বে, যা যুদ্ধই সর্বার্থে, ঢাকের কাঠি পড়ে দেওয়ালে। নির্বাচনী হাওয়া ওঠার অনেক-অনেক আগেই শুরু হয়ে যায় দেওয়াল-লিখনের লড়াই। এ লড়াইয়ের বারুদের উত্তাপ শুধু যে শহরের অলিগলি দখল করে তা নয়, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলকেও গ্রাস করে। গ্রাম্য বধূর সুন্দর করে নিকানো দেওয়াল, গোয়ালঘরের আঙিনা, ভগ্নপ্রায় মন্দির, পরিত্যক্ত উপুড়-করে-রাখা নৌকা, এমনকী বয়োবৃদ্ধ বিশালবপু বটগাছ—সর্বত্রই আছড়ে পড়ে ভোট-জোয়ারের প্রবল চোরা স্রোত।

বহুবিচিত্র বর্ণের দেওয়াল-লিখন দেশ তথা সমাজের সৌন্দর্যহানির কারণ, নাকি শোভাবর্ধনকারী—এ নিয়ে বাদানুবাদ-বিতর্কের শেষ নেই। বহুল-প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলমে বা জনপ্রিয় সাপ্তাহিকের পাতায় সে বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটে। জীবনযুদ্ধে অস্থির ভোটারের চিত্ত দেওয়ালের শ্লোগানে 'স্থিত' হয় কিনা, হলপ করে কেউ বলতে পারে না। ভোটারের মনের গোপন তরঙ্গ মোনালিসার হাসির চেয়েও ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে, তাকে মাপার জুতসই কোনো যন্ত্র এ যাবৎ আবিষ্কৃত না হওয়ায় আমাদেরকে নির্বাচন-মনস্তত্ত্ববিদদের অমৃতবাণীর উপর নির্ভর করতে হয়—আস্থাহীন নির্ভরতা।

তার্কিক নান্দনিক আলোচনা যাই হোক না কেন, ঘটনা হল এই যে, ভোটযুদ্ধে দেওয়াল-লিখনের লড়াইয়ের দাপট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সমাজ-বিজ্ঞানের সামান্য একজন ছাত্র হিসাবে ভোটের দেওয়াল-লিখন আমার কাছে নানান কারণে আগ্রহের বিষয়। দেওয়াল-লিখনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমত, ভোটের দেওয়াল-লিখন যুযুধান রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সাংগঠনিক প্রসারতা, গভীরতা, আর তৎপরতার পরিচয় দেয়। আমাদের মতো সুবিশাল দেশে কোন্ রাজনৈতিক শক্তির শিকড় কতদূর বিস্তৃত, তবে কিছুটা হদিস মেলে দেওয়ালে।

দ্বিতীয়ত, ইস্কুল-কলেজ-চাকরির পরীক্ষায় কিংবা খেলার মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাক্-মানসিক প্রস্তুতি সাফল্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। ভোটের দেওয়াল-লিখন বিবদমান দলগুলির মধ্যে যেমন অন্যের প্রতি একের শক্তিপ্রদর্শন, অন্যদিকে তৃণমূল-স্তরে সর্বক্ষণের সাধারণ দলীয় কর্মীদের মানসিকভাবে উদ্দীপ্ত করার উপায়ও বটে।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে সত্য আর মিথ্যার বেসাতি একই সাথে চলে। জনগণকে বেছে নিতে হয়, বুঝে নিতে হয়। এভাবেই রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসার ঘটে। দেওয়ালে-দেওয়ালে বিভিন্ন দল সত্য-মিথ্যার আশ্রয়ে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া প্রতিশ্রুতি; রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইস্যু তুলে ধরে। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষণে এর ভূমিকা কম নয়।

চতুর্থত, ভোটের দেওয়াল-লিখন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা দল-মত-গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা মানস প্রকৃতির পরিচয়বাহী। মার্জিত রুচিশীল অথবা কুৎসানির্ভর রুচিহীন শ্লোগান, গ্রাফিটি বা ব্যঙ্গচিত্র যে সামগ্রিক চিত্রটি তুলে ধরে, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মানসিকতার দীনতা বা সমৃদ্ধি বোঝাতে সেটি বিশেষভাবে সহায়ক।

আরও একাধিক দিক থেকে দেওয়াল-লিখনের তাৎপর্য নির্দেশ করা সম্ভব।

সম্প্রতি প্রতিবেশী বাংলাদেশে এক প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের মতো সে দেশের জনগণের গণতন্ত্রের জন্য এই সংগ্রাম আমাকেও আকৃষ্ট করেছে। আমার সৌভাগ্য এই যে, গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি সেই ঐতিহাসিক নির্বাচন-যুদ্ধের আগে আর পরে বেশ কিছুদিন সেদেশে অবস্থান করেছিলাম। ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল সহ বেশ কিছু স্থানে ঘুরে বেড়ানোর ফাঁকে ভোটযুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছে। মিটিং, মিছিল, সভা-সমিতির পাশাপাশি দেওয়াল-লিখনের লড়াই জমে উঠতে দেখেছি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি), আওয়ামি লীগ, জাতীয় পার্টি, জামাত-ই-ইসলামি সহ ছোটো-বড়ো সকল প্রতিদ্বন্দ্বী দল মায় নির্দল প্রার্থীরাও দেওয়ালকে ব্যবহার করেছেন যথেচ্ছ। মাদ্রাসা-মক্তব-মসজিদ-কবরস্থান, এমনকী বিদ্রোহী কবি নজরুল যেখানে শায়িত আছেন, সেই ঐতিহাসিক সমাধিবাগও নিস্তার পায় নি।

প্রথমেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, শুধু দেওয়াল-যুদ্ধেই নয়, সমগ্র নির্বাচনী প্রচারে সবিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে বিশেষ কয়েকটি ইস্যু। যেমন, ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ইসলামি রাষ্ট্রাদর্শ, বাংলাদেশী বনাম বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের আধুনিকীকরণে কার ভূমিকা কতটুকু, এবং অবশ্যই ভারতের প্রতি মনোভাব। প্রতিটি দলকেই এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে কোনো-না-কোনো অবস্থান নিতে হয়েছে। গৌণভাবে এসেছে সমাজতন্ত্র, উপসাগরীয় যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সমস্যাদি। ভয়াবহ দারিদ্র্য যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, দেওয়ালের দর্পণে তেমনটি অন্তত মনে হয় নি।

তৃতীয় বিশ্বের সমস্যাকবলিত দেশগুলিতে গণতন্ত্রকে সফল করে তোলা সহজ নয়। পদে-পদে বাধা, জাত-পাত, ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা, ভয়াবহ দারিদ্র্য রাজনৈতিক চেতনাবোধের স্বাভাবিক স্বচ্ছ বিকাশে মস্ত বাধা গড়ে তোলে। বহুবিধ সামন্ততান্ত্রিক মধ্য-যুগীয় অনুভূতি, ধ্যানধারণার প্রবল আতিশয্যে রুদ্ধ হয় আধুনিক মননশীলতা। এই স্বাভাবিক সাধারণ সূত্রের ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশ। দেশটির রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণই মুসলমান। ভোট-যুদ্ধে এই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আদায়ে তাই চলে সহজ ও সুনিশ্চিত পথের সন্ধান। আর সে-কারণেই ভোটের প্রচারে প্রাধান্য পায় ধর্মীয় অনুষঙ্গ প্রতীক। জামাত-ই-ইসলামির লক্ষ্য আদর্শ কর্মসূচী পুরোপুরি ধর্মভিত্তিক। তাই তাদের দেওয়াল-লিখনে অনিবার্যভাবেই এসেছে ধর্মীয় আবেদন—

'ভোট দিলে পাল্লায়
খুশি হবেন আল্লাহ্' কিংবা
'৯১-এর সেপ্টিমেন্ট/আল-কোরানের পার্লামেন্ট'

বিএনপিও ঐসলামিক রাষ্ট্রাদর্শে বিশ্বাসী, কিন্তু বিএনপি ও জামায়াত সমার্থক নয়; বাংলাদেশে ঘোরতর এক জাতীয়তাবাদী পার্টি রূপেই তার প্রধান পরিচয়। সেই বিএনপি-র দেওয়াল-লিখন লক্ষণীয়:

ক. 'লা এলাহা ইল্লাল-লাহ,
ধানের শীষে বিছ্‌মিল্লাহ।'
খ. 'সংবিধানে শহীদ জিয়া,
লিখে গেছেন বিছ্‌মিল্লাহ।'

বিশ্বাসী ধর্মভীরু মুসলমানের কাছে লা-এলাহার তাৎপর্য অপরিসীম। মুসলমান হওয়ার প্রাথমিক শর্তই এই কলেমাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের বিশালসংখ্যক সংখ্যালঘু ভোটার বিএনপি-র প্রচারের লক্ষ্য নয়, কেননা ইসলামের কলেমা কখনও অমুসলিম ভোটারকে উদ্দীপ্ত করতে পারে না। ধর্মাশ্রয়ী এই আবেদনের সাথে পাল্লা দেওয়া 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-আদর্শবাহী আওয়ামি লীগ বা অন্য কোনো দলের পক্ষে খুব সহজ ছিল না।







লীগের আবেদন—

আমরা মানি ধর্মনিরপেক্ষতা
আমরা মানি ধর্মের পবিত্রতা
আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা নয় ধর্মহীনতা

স্থানকালপাত্রের প্রেক্ষিতে উভয় আবেদনের পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। কোনো সন্দেহ নেই, ভোটের ময়দানে বিএনপি-র এই মোক্ষম চালের পালটা চাল দিয়ে কিস্তি মাত করা চিন্তা ও প্রয়োগে সমান দুরূহ। লীগ পারে নি। উপমহাদেশের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার অস্ত্র ক্রমশ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কোন্ কোলেই বাতাশক্তিশালী ছিল।

ধর্মীয় সেনটিমেনটের সাথে যুক্ত হয়েছে উদীয়মান জাতীয়তাবাদের স্পর্শকাতরতা। 'আমরা বাঙালি না বাংলাদেশী'—এই বিতর্ক অনেকদিন ধরেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষদের আলোড়িত করেছে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক। তাঁর কাছে বাঙালি ও বাংলাদেশী জাতীয় সত্তা কখনও পৃথক অর্থ বহন করে নি। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" ধারণার ব্যাপক প্রচার আর প্রসার ঘটান। বলা বাহুল্য ঢাকা তথা বাংলাদেশের অধিকাংশ আত্মপ্রতিষ্ঠ মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে সেটি হয়েছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। এর ফলে, উপমহাদেশের অবশিষ্ট বাঙালি, মুখ্যত যাঁরা হিন্দু-সংস্কৃতিবাহী, তাঁদের থেকে নিজেদেরকে (মুখ্যত মুসলমান) স্বতন্ত্র করা সম্ভব হয়েছে। নিঃসন্দেহে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূলে একটি কারণ অন্যতে হারিয়ে যাওয়ার সূক্ষ্ম অবচেতনগত শঙ্কাবোধ। নির্বাচনে বিএনপি তার এই শক্তিশালী অবলম্বনকে ব্যবহার করেছে বুদ্ধিমত্তার সাথে।

'আল্লাহর আইনের প্রতি অবিচল আস্থা ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএনপি-কে ভোট দিন'—ছাত্রসমাজকে খালেদার দল যে অনেক বেশি আকৃষ্ট করতে পেরেছে, তার অন্যতম কারণও এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আকর্ষণ।

নির্বাচনে একাধিক দল, দলীয় জোট যোগ দিলেও লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছেন দুই নারী —খালেদা জিয়া আর শেখ হাসিনা। দেওয়ালের অধিকাংশ স্থান দখল করেছেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁরাই। ছিলেন অবশ্য আরও একজন—ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এরশাদ-বিরোধী গণআন্দোলনের প্রবল ঢেউ, স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচার, অর্থলুণ্ঠন, ক্ষমতা-অপব্যবহার প্রভৃতি পাহাড়সমান অপবাদ নিয়ে কারার অন্তরাল থেকেও তিনি দেওয়ালে-দেওয়ালে সরব হয়েছেন। জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের সমর্থনে দেওয়ালে এরশাদ-বন্দনা—

ক. '৮৮'র বন্যায় / এরশাদ তোমারে ভুলি নাই,'
খ. 'উন্নয়নের অপর নাম / এরশাদের সংগ্রাম।'

লীগের নেত্রীরূপে মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনার কাজকর্ম, চালচলন যথার্থই গণতান্ত্রিক, না স্বেচ্ছাচারী একনায়কতন্ত্রসুলভ—এ নিয়েই ক্ষোভ, হতাশার প্রকাশ দেখছি তরুণ একনিষ্ঠ লীগ-কর্মীদের মধ্যে। ড. কামাল হোসেন সহ একাধিক জনপ্রিয় লীগ নেতৃবৃন্দ হাসিনার দ্বারা অবহেলিত অপমানিত—এমনতর বহু অভিযোগ শুনেছি মুক্তমনা গণতন্ত্র-প্রেমী রাজনীতিসচেতন বুদ্ধিজীবীদের কাছে। সেই হাসিনার পক্ষে লীগের প্রচারের সবচেয়ে বড়ো শ্লোগান 'গণতন্ত্র'—

'শেখ হাসিনার আরেক নাম,
গণতন্ত্রের সংগ্রাম।'

বাংলাদেশের গর্ব, অহংকার তার ভাষা, বাংলা-ভাষার জন্য আত্মত্যাগের দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী সংগ্রাম। এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার শহীদমিনারে হাজার-হাজার মানুষের যে সঙ্গীতমুখর প্রশান্ত প্রভাতফেরি দেখেছি তা বিস্ময়কর, অভূতপূর্ব। সেই মাতৃভাষার সাথে একাত্ম করা হয়েছে হাসিনাকে—

'আ মরি বাংলাভাষা
শেখ হাসিনা মোদের আশা।'

বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের

আশা-ভরসা ন্যস্ত করেছেন বেগম জিয়ার প্রসারিত হাতে। আপাতদৃষ্টিতে খালেদাকে যতই বিনম্র, নীরব, অন্তরমুখী ব্যক্তিত্ব মনে হোক না কেন, আসলে তিনি অনেক বেশি বাস্তবানুগ, প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন দৃঢ়চেতা নেত্রী। ধীরে-ধীরে তিনি শুধু যে বি. এন. পি.-র শক্ত ভিত গড়ে তুলেছেন তা নয়, জনমানসে নিজের এক উজ্জ্বল সংগ্রামী, আপোসহীন ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছেন। তাঁর দল তাঁকে ভূষিত করেছে অসামান্য গাথায়—

ক. মহাবিপ্লবের জন্মদায়িনী রুদ্ররাগিণী
খালেদা জিয়া
খ. বাংলাদেশের কোরাজন
খালেদা জিয়া লহ সালাম।
গ. চিনে নিক ওরা বাংলার মাটি
খালেদা জিয়ার শক্ত ঘাঁটি।
ঘ. নেত্রী মোদের আপোষহীন
ধানের শীষে ভোট দিন।

আবেগে আতিশয্য আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু ব্যালট-বক্সের ভাগ্য-নির্ধারণে আবেগ তো ফেলনা নয়।

কিন্তু খালেদা নন, হাসিনা নন, নন এরশাদ। বাংলাদেশের প্রথম যথার্থ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন দুজন প্রয়াত ব্যক্তিত্ব —জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। ঢাকা সহ বাংলাদেশের সর্বত্রই চোখে পড়েছে সুদৃশ্য তোরণ এবং দুই প্রয়াত নেতার বড়ো-বড়ো কাট-আউট। একাত্তরের রমনাপার্কের ঐতিহাসিক জনসমাবেশে অঙ্গুলি-উত্তোলিত বঙ্গবন্ধুর সেই উদাত্ত আহ্বান—

এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

পাশাপাশি মিলিটারি সাজে সজ্জিত জিয়াউর রহমানকে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষকরূপে। ছড়ায়, গানে উভয় দলই তাঁদের নেতাকে বড়ো করে তুলে ধরেছে দেওয়ালে। জিয়ার প্রতি বি. এন. পি.-র শ্রদ্ধানিবেদন—

জিয়া তুমি আছ মিশে,
বাংলাদেশের ধানের শীষে।

অপরদিকে শেখ মুজিবর নামের যে মন্ত্রধ্বনি একদিন বাঙালি হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছিল লীগ চেয়েছে তার পুনরুজ্জীবন—

ক. যতদিন রবে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা বহমান
ততদিন অমর রবে শেখ মুজিবর রহমান।
খ. মুজিব মানে আর কিছু নয় এক যমুনা রক্ত
তাই তো আমরা শেখ মুজিবের ভক্ত।

সমাজতন্ত্রের আজ বিশ্বজোড়া সংকট। সেই সংকটের প্রভাব পড়েছে উপমহাদেশের সমাজতন্ত্রী চিন্তা-চেতনা-আন্দোলনে। বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি, বাকশাল, ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি (ন্যাপ), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) প্রভৃতি কোনো না কোনোভাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী। ৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানে তারা প্রত্যেকেই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ এই বাম-পন্থী শক্তিসমূহের উপর অনেক আশা রেখেছিলেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যকার কলহ, পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে এদের পক্ষে নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ তৃতীয় শক্তিরূপে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় নি। ধর্মীয় মৌলবাদের প্রবল উত্থান-হেতু ভীতি, নির্বাচনে সাফল্যের দুর্জয় লোভ, সর্বোপরি বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপর্যয় এদের কাউকেই দুঃসাহসী করে তোলে নি 'সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতা' ঘোষণায়। 'দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ এক হও' কিংবা 'শৃঙ্খল ছাড়া শ্রমিকের হারানোর কিছু নেই, জয় করার জন্য আছে সমগ্র পৃথিবী'— এমনতর বৈপ্লবিক শ্লোগান কোথাও চোখে পড়ে নি। অথচ গানের জলসায়, একুশের উৎসবে শুনেছি শ্রম-জীবী মানুষের বিজয়বার্তা—

'সর্বহারা জনতার জিন্দাবাদ বাতাসে
বিপ্লবের রক্তরাঙা ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে।'





শুনেছি সমবেত কণ্ঠের দৃপ্ত প্রত্যয়—

'লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয়
শোষিত মানুষের একতার জয়।'

না, এসবের ছিটেফোঁটা ছিল না দেওয়ালে। প্রকারান্তরে মৌলবাদের আশ্রয় নিতে পিছুপা হন নি কোনো-কোনো বামপন্থী। নির্বাচনী জনসভায় পুরোদস্তুর মুসলমানি লেবাসে উপস্থিত হয়েছেন কেউ-কেউ। ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে তথাকথিত প্রগতিশীল আদর্শবাদীদের আকছার ডিগবাজি খেতে দেখতে অবশ্য আমরা অভ্যস্ত। বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রীদের পরিবর্তে একাধিক জায়গায় দেখেছি জামাত-ই-ইসলামের উল্লসিত ঘোষণা—

মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের দিন শেষ, এবার ইসলামি সমাজতন্ত্র।

প্রসঙ্গ ভারত। বাংলাদেশে ভারতের প্রতি একটা অবিশ্বাস, সন্দেহপ্রবণতা নানা কারণে বাংলাদেশের জনমানসে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছে ও হচ্ছে। বিশেষত, শহুরে শিক্ষিত, আর্থিকভাবে স্ব-নির্ভর সচ্ছল মানুষদের মধ্যে ভারতভীতি ও ভারতবিদ্বেষ যে ক্রম-সঞ্চরমাণ, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই অবস্থাকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করার জন্য সমস্ত রকম প্রয়াস নিয়েছে বি. এন. পি, জামাত, ফ্রিডম পার্টি, জাকের পার্টি ও অন্যান্য দল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি দেওয়াল-লিখন তুলে ধরা যাক—

ক. বিদেশী দালালের হাত হতে
ভোট দিন দেশ বাঁচাতে
বাংলাদেশের ধানের শীষে। (বি. এন. পি.)
খ. সীমান্তের ওপারে আমাদের বন্ধু আছে, প্রভু নেই। (যুব ছাত্র দল)
গ. নাস্তিক রাশিয়া কিম্বা বিধর্মী ভারত নয়, এটা আমাদের বাংলাদেশ। (জামাত)

পরিষ্কার ভাষা, ততোধিক স্বচ্ছ অর্থ। এসব প্রচারের মূল লক্ষ্য যে দল, সেই আওয়ামি লীগ অপবাদ খণ্ডনের জুতসই কোনো জবাব দিতে পারে নি। সন্দেহ নেই ভারত-বিরোধ ভোটের ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

তবে শেষ বিচারে, ধর্মীয় মৌলবাদ, উদীয়মান জাতীয়তাবাদের স্পর্শকাতরতা, বা ভারতবিদ্বেষ নয়, বাংলাদেশের ভোটযুদ্ধে সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে গণতন্ত্রের জন্য সার্বিক আকুলতা। গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষর, নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে মুক্ত ভোটের হাওয়া উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। বন্দুকের নলের শাসানিতে ভোট নয়, শাসকদলের দর্পিত হুঙ্কারে ভোট নয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট। গণতন্ত্রের ইতিহাসে এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

আমার ভোট আমি দেব,
যারে খুশি তারে দেব।

গণতন্ত্রের অভিযাত্রীদের এই আহ্বান পৌঁছে গিয়েছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। ভোটের দিন যত এগিয়ে এসেছে, উত্তেজনা প্রচার তত তুঙ্গে উঠেছে। এই পর্বে দলীয় সংঘর্ষ প্রাণহানি যে ঘটে নি তা নয়, কিন্তু ভোট হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত, নির্বিঘ্ন অবাধ পরিবেশে।

গ্রামময় নদ-নদী, খাল-বিলের দেশ বাংলাদেশ, নদীমাতৃক সভ্যতার অকৃত্রিম সারল্য ভোটযুদ্ধে, দেওয়াল লড়াইয়ে ক্ষুণ্ন হয় নি। 'পেটভরে ভাত খাব। ধানের শীষে ভোট দেব'—বি এন পি-র শ্লোগান সেই সারল্যের মূর্ত প্রকাশ। কোথাও কোনো দেওয়ালে কোনো কুরুচিপূর্ণ ব্যঙ্গচিত্র, মানহানিকর বক্রোক্তি বা অশ্লীল শ্লোগান দেখি নি। হাসিনা বা খালেদাকে কুচক্রী ডাইনি বুড়ি অথবা রাক্ষুসী বেশে চিত্রিত করা হয় নি। পারিবারিক কেচ্ছা তুলে ধরার প্রয়াসও কোথাও পরিলক্ষিত হয় নি।

ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিরোধী আন্দোলন কী তুঙ্গে, কী তীব্র ঘৃণা, কী নিদারুণ বিষোদগার, অথচ খোদ ঢাকা শহরেই এরশাদের একটিও ব্যঙ্গচিত্র চোখে পড়ে নি। কেবলমাত্র মিটিং-

মিছিলে উত্তেজিত অল্পবয়সী তরুণদের শ্লোগান শুনেছি—'বিষকন্যা। শেখ হাসিনা' অথবা 'ক্যান্টনমেন্টের ভাবীজান / আরেক নামে পাকিস্তান'—ব্যস, এইটুকুই।

গণতন্ত্র কেবল ধর্মনিরপেক্ষতা প্রগতিশীলতা নয়, নয় বহুদলীয় ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গণতন্ত্র এক মহৎ জীবনাদর্শ। সুস্থ, সবল, রুচিপূর্ণ পরিমার্জিত সংযত মানবিক মূল্যবোধ যেখানে পদানত, লাঞ্ছিত হয়—বিকৃত পরচর্চা, কুৎসানির্ভর রুচিহীন রাজনীতি-সর্বস্বতায়, গণতন্ত্রের অহংকার সেখানে আসলে শূন্যগর্ভ ঢক্কানিনাদমাত্র। বাংলাদেশের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। হয়তো আরও কিছু মূল্যবোধ, আধুনিক চেতনা। কিন্তু যে গণতান্ত্রিক রুচিশীলতার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে তার সুদূরপ্রসারী মূল্য কম নয়।

গণতন্ত্রের বহুমূল্য ভূষণ পরমতসহিষ্ণুতা, বাক্-স্বাধীনতা মতামতপ্রকাশের স্বাধীনতা। ভোটের দেওয়াল-লিখনে জয়ী হয়েছে এই মহার্ঘ আদর্শও। উদার গণতন্ত্রের অন্যতম পুরোহিত জন স্টুয়ার্ট মিল মনে করতেন, যে রাষ্ট্র সমাজের সংখ্যালঘু দুর্বল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, তার উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। ভোটযুদ্ধে দেওয়ালের লড়াইয়ে দুর্বল প্রায়শই ঢাকা পড়ে সবলের দম্ভে, আস্ফালনে। তাই দেখা যায় অধিকৃত দেওয়ালকে দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য দলীয় একচ্ছত্র সম্পত্তিরূপে ঘোষণা করতে। দেখা যায় প্রভাবশালী দল কর্তৃক 'না-পছন্দ' দলের দেওয়াল-লিখন বাহুবলে বেমালুম মুছে ফেলতে।

বাংলাদেশে আজ ধর্মীয় মৌলবাদ সক্রিয়। আপন সন্তানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং ধর্মীয় শিক্ষা না দেওয়ার কারণে সন্ত্রাস্ত অভিজাত স্ব-নির্ভর 'বিশ্বাসী' গৃহবধূর মানসিক-সামাজিক বিপন্নতাবোধ দেখেছি, দেখেছি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেক্যুলার শিক্ষাকাঠামোর মধ্যে বিভাগীয় রজতজয়ন্তী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ। কিন্তু এ সবই শেষ কথা নয়। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রগতিশীলতা সংগ্রামরত। কিন্তু কোথাও কোনো শক্তিপ্রদর্শনের বাহুল্য নেই। ভোটের দেওয়াল-লিখনেও তাই। ধর্মীয় মৌলবাদকে বল-প্রয়োগে নিশ্চিহ্ন করা নয়, সাংবিধানিক শান্তিপূর্ণ পথে বিরুদ্ধতাচারণ। আর সে কারণেই একই দেওয়ালে গায়ে-গায়ে, গা লাগিয়ে নিম্নোক্ত শ্লোগান-দ্বয়ের বিস্ময়কর অবস্থান—

আল্লাহর আইন ও সংলোকের শাসন চাই
(জামাত)

হে আল্লাহ, জামায়াতের হাত হতে
বাংলাদেশকে বাঁচান
(যুব ছাত্র ইউনিয়ন)

এমন চূড়ান্ত পরস্পরবিরোধী শ্লোগান একই সাথে শোভা পাচ্ছে, কেউ মুছতে আসছে না, বলপ্রয়োগে উৎপাটন করছে না অন্যমত—এর চেয়ে বড়ো সম্পদ গণতন্ত্রের আর কী আছে?

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণারত তরুণ স্কলার আবদুস সামাদ গায়েন কিছুকাল আগে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের সময় শ্রীমতী গৌরী আইয়ুবের সঙ্গে ওই দেশ ঘুরে এসেছেন।







## সমাজতন্ত্রের মহিমা কি আজ ম্লান?

**বেণু গুহঠাকুরতা**

সমাজতন্ত্র আজ ধনতন্ত্রের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত। তারই কারণ অনুসন্ধানে এই উপমহাদেশের মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের প্রয়াস লিপিবদ্ধ হয়েছে সমালোচ্য বই দুটিতে। লেখকদের প্রধানত দুটি দলে ভাগ করা যায়। একদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমানে সমাজতন্ত্রের পুনর্গঠনের জন্য যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে—তার সমর্থকেরা; অপর দিকে আছেন তাদের বিরোধীরা—যদিও সকলেই সমাজব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ে বিশ্বাসী।

"পরিবর্তনশীল সমাজতন্ত্র—প্রেক্ষাপট ও সমস্যা" বইটিতে পশ্চিমবাঙলার মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের এক অংশ অনুসন্ধান করছেন কেন সমাজবাদ এত দ্রুত পূর্ব ইউরোপে তথা সোভিয়েত ইউনিয়নে ভাঙনের দিকে এগিয়ে গেল? কোথায় তার গলদ আর উদ্ধারের রাস্তাটাই বা কোথায়? নীহাররঞ্জন সরকারের মতে, 'ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক কারণের মধ্যে, শ্রমিক আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির চাপে এই পরিবর্তনগুলি এসেছে। কাজেই এই পরিবর্তনকে স্বীকার করলে মার্কসবাদের বিচ্যুতি ঘটবে কিংবা সংস্কারবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে, সেটা মনে করা উচিত নয়।' তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, 'সোভিয়েত এবং অন্য দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্র যদি প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং সমাজতন্ত্রের এমন একটা স্বরূপ প্রকাশ পায়, যার দ্বারা মানবজাতির মূল্যবোধ স্বীকৃত, তাহলে এই ধরনের সমাজতন্ত্র সমস্ত মানুষকেই আকৃষ্ট করবে। এই সমাজতন্ত্রই ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাতে পারবে।'

সুনীল সেন তাঁর ছোট্ট প্রবন্ধে সহজ ভাষায় যা ব্যক্ত করেছেন তার অর্থ এক কথায় দাঁড়ায়—এই সংকটের জন্য অংশত দায়ী লেনিন এবং স্তালিন। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় এই আলোড়নে ভীত হবার কোনো কারণ নেই। 'রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ দেশের অর্থ-নৈতিক জীবনে কী গভীর পরিবর্তন আনতে পারে, মার্কস তা সঠিক ধরতে পারেন নি। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র তাঁর জীবিত কালে দৃশ্য হয় নি। ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান কত উন্নত করতে পারে, মার্কস তা অনুমান করতে পারেন নি···এই জগৎকে বোঝার এবং বদল করার একটি পদ্ধতি মার্কস আবিষ্কার করেছিলেন। সমাজবাদীরা এখন মার্কসীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন।···সৃজনশীল মার্কসবাদ গড়ে উঠবে এই পথ ধরে।' বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় যা-কিছু ঘটছে তাকে তিনি স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, 'কমিউনিস্ট জগতে এসেছে এক নতুন প্রভাত' (পৃ ১৫-১৬)।

বাসব সরকারের প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে এক ধরনের উষ্মা। বর্তমান ঘটনাবলীতে তিনি বিরক্ত। সমাজ-তান্ত্রিক নৈতিকতার মানকে তিনি জঘন্যতম ধনতান্ত্রিক নৈতিক মানের সমতুল্য বলে ঘোষণা করে বলেছেন, 'ব্রিটেনে টোরী দল লেবার পার্টিকে হারাতে যদি

**পরিবর্তনশীল সমাজতন্ত্র**—সম্পাদক, শোভনলাল দত্তগুপ্ত, যৌথ অধিকারী, ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল স্টাডিজের পক্ষে। চাটার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা-৪১। কুড়ি টাকা।

**প্রসঙ্গ: রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ**—বদরুদ্দীন উমর। চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৭৩। সাতাশ টাকা।

জিনোভিয়েভ লেটার-এর গল্প ফাঁদতে পেরে থাকে ১৯২৪-২৫ সালে, তাহলে তাদের যোগ্য উত্তরসাধকদের আজকের সোভিয়েতে পাওয়া যাবে না, তেমন মনে করার কোনো কারণ নেই' (পৃ ৩৩)। তিনি সঠিকভাবেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলিত নানা দুর্বল দিকগুলির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, যেগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। শেষ পর্যন্ত তাঁর লেখাতে যে সুরটা ফুটে উঠেছে, সেটা হতাশার। 'পেরেস্ত্রোইকা এবং গ্লাসনস্ত ভালোভাবে চালু হওয়ার আগেই বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকরী অবসান ঘটেছে। সোভিয়েতে তার রিনিউয়াল কোন ধরনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে সেই দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া সমাজতন্ত্রের নামমাহাত্ম্যে আর গর্ব করার মতো বিশেষ কিছুই রইল বলে মনে করা যাচ্ছে না' (পৃ ১০) বলে তিনি বক্তব্য শেষ করেছেন।

কল্যাণ দত্ত পেরেস্ত্রোইকার সমর্থনে তাঁর প্রবন্ধে এই নতুন অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে তার সমর্থনে সমস্ত সুপরিচিত যুক্তিগুলিকে স্বল্প পরিসরে সুন্দরভাবে তুলে ধরে আশা প্রকাশ করেছেন—এই পুনর্গঠনের ফলে খুলে যাচ্ছে এক নতুন দিগন্ত যাতে ধনতন্ত্র ফিরে আসার কোনো প্রশ্ন নেই, কারণ এই ব্যবস্থাতে জমি আর উৎপাদনের উপকরণ রাষ্ট্রীয় মালিকানাতেই থেকে যাচ্ছে।

জলি কউলের মতে, 'এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিচার করলে দেখা যাবে যে এই আন্দোলনের মাধ্যমে সত্যিকারের মার্কসবাদী-গণতান্ত্রিক সরকার গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে' (পৃ ৫৮)। তাঁর মতে, পূর্ব ইউরোপ তথা সমাজতন্ত্রের সংকটের মূল কারণ 'বুর্জোয়া সমাজের সংকট যে কারণে হয়, সমাজতান্ত্রিক সমাজেও সেই শক্তিগুলিই উল্টোভাবে কাজ করে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে।' বুর্জোয়া-শাসিত সমাজে বণ্টনব্যবস্থা উৎপাদনশক্তি থেকে পিছিয়ে পড়ার জন্য সংকট সৃষ্টি করে আর পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদনশক্তি বণ্টনব্যবস্থা থেকে পিছিয়ে ছিল বলে সংকট সৃষ্টি করেছে (পৃ ৬১-৬২)। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সংকট কী ভাবে কাটিয়ে উঠছে সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে নতুন কিছু পাওয়া গেল না।

নরহরি কবিরাজ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জনগণের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। 'লেনিনের ধারণা ছিল—সমাজতান্ত্রিক সমাজ যতই অগ্রসর হবে ততই রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং সেই অনুপাতে সমাজের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে—জনগণের স্বশাসনের ধারাটি পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু স্তালিনের আমলে ঘটল তার বিপরীত। রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্বগ্রাসী এবং সমাজে জনগণের অধিকার ক্রমশ রুদ্ধ হল। "সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা" লেনিনের এই নীতি পুরোপুরি উপেক্ষিত হল' (পৃ ৭৬)। তা ছাড়া, 'এতদিন মার্কসবাদীদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রম এবং মূলধনের মধ্যে বিরোধ যেহেতু অনিবার্য, তাই এই ব্যবস্থা কখনও সংকটের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তা ছাড়া, ঐতিহাসিক রুশ-বিপ্লবের সাফল্যের পর পৃথিবীব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের বিপুল অগ্রগতির মুখে এই সংকট সর্বব্যাপী এক সাধারণ সংকটের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেহেতু শ্রেণীশোষণমুক্ত, তাই এই সমাজে সংকটের অস্তিত্ব নেই এবং এই ব্যবস্থার অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। বর্তমানের ঘটনাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে এ এক অতিসরলীকৃত ধারণা ছাড়া কিছু নয়' (পৃ ৭৪)। এই দুই ব্যর্থতার যোগফলই পেরেস্ত্রোইকার পটভূমি। এর ফলে আশা করা যায়, 'আগামী দিনগুলিতে জনগণের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পৃথিবীর মানুষের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে' (পৃ ৮৩)।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর "পেরেস্ত্রোইকার নতুন সংজ্ঞা" প্রবন্ধে তাঁর পার্টি আর. এস. পি.-র চিন্তা-







ধারা অনুযায়ী বিশদ আলোচনার পর এর মধ্যে সমাজবাদী আন্দোলনের কোনো নতুন দিক্‌নির্ণয়ের ইঙ্গিত দেখতে পান নি। তাঁর মতে, 'আমরা বিপ্লবী সমাজবাদীরা স্তালিনের "একদেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয় বিজয়" এবং ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের দীর্ঘকালীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং ক্রুশ্চেভীয় শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা তত্ত্বের সংস্কারবাদী এবং বিপ্লববিমুখ চরিত্র সম্পর্কে কোনোকালেই মোহগ্রস্ত ছিলাম না। ধনতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে এবং স্তালিন আর নয়া-স্তালিনবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামে বিপ্লবী মার্কস-লেনিনবাদের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরাই আর. এস. পি.-র ঐতিহ্য।.....আমরা মনে করি সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় কোনো বিশেষ দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের সাফল্যের উপরই নির্ভর করে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।'

জনাব বদরুদ্দীন উমরের "প্রসঙ্গ : রাশিয়া ও পূর্ব-ইউরোপ" সম্পূর্ণ অন্য সুরে লেখা। তাঁর বক্তব্য বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত, কারণ তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের একজন সুপরিচিত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। তা ছাড়া সে দেশের একটি কমিউনিস্ট পার্টির তিনি সম্পাদক।

দশটি প্রবন্ধ জুড়ে তিনি সমাজতন্ত্রের অধুনাতম সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একটি প্রবন্ধ "মাদকদ্রব্য চোরাচালান ও সাম্রাজ্যবাদের সংকট" এই বইতে একটু বেসুরো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, "সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ" প্রবন্ধটি চতুরঙ্গের গত নভেম্বর (১৯৯০) সংখ্যাতে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

বদরুদ্দীন উমরের প্রবন্ধগুলি মূলত একই সুরে বাঁধা, আর সেটা হল লেনিন- আর স্তালিন-প্রবর্তিত পথই প্রকৃত সমাজতন্ত্রের পথ এবং সমাজতন্ত্রী দুনিয়াতে সেই পথের একমাত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আলবেনিয়া। পুনর্গঠনের নামে যা-কিছু এখন চলছে, সেগুলি সবই প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টা মাত্র। ধনতন্ত্রের সংকট ঘনীভূত হচ্ছে, এবং তার পতন অনিবার্য। যাঁরা স্তালিনকে রুশ-বিপ্লবের সার্থকতম নায়ক বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে বইটি নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে।

ছোটো বই থেকেই একটা কথা বেরিয়ে আসছে, সেটা হল এই যে, সমাজতন্ত্র যে মহিমা নিয়ে এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হয়েছিল, তার সে মহিমা আজ অনেকটাই ম্লান। সেই হারানো মহিমা ফিরে পাওয়ার জন্যই সব ঢঙের সমাজতন্ত্রীদের এই প্রয়াস। যাঁরা পুরনো পথটাকেই আঁকড়ে থাকতে চান, তাঁদের কথা থেকে সেই পথটা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে গেল কেন, তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য জবাব পাওয়া গেল না। কেবল কয়েকজন প্রতিবিপ্লবীর চেষ্টাতে একটা সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে গেল—এটাকে ঠিক মার্কসবাদী ব্যাখ্যা বলা যাবে না। আর সেটা কোন্ ধরনের সমাজতন্ত্র যেটা এত গাদা-গাদা প্রতিবিপ্লবীর শুধু জন্ম দেয় না, তাঁরা পার্টির কর্মকর্তা হয়ে আসর জাঁকিয়ে বসে থাকেন? কোনো তত্ত্বে অন্ধ বিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে মার্কসবাদ বাঁচবে না। যেমন বাঁচল না আলবেনিয়ার একদলীয় শাসনব্যবস্থা আর তার নেতা রামিজ আলিয়া।

সমাজতন্ত্রের পুনর্গঠনের কথা যাঁরা আলোচিত প্রথম বইতে বলেছেন, তাঁদের ভাবনাটা পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না। বোধহয় এতদিনের ধ্যান-ধারণাগুলো হঠাৎ ত্যাগ করতে অসুবিধে হচ্ছে। তাই তাঁদের লেখাতে কেমন একটা দ্বিধার ভাব, শেষ পর্যন্ত 'বোধ হয়' জাতীয় শব্দের আড়ালে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। আজকে সমাজতন্ত্রের সমস্যার আলোচনা সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে অনেক প্রশ্নই এসে যাবে। তাদের বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে সমাজতন্ত্রকে বাঁচানো যাবে না। যেমন ধরা যাক, সমাজতন্ত্রের দেশগুলিতে শোষণহীন

সমাজব্যবস্থা অর্থাৎ অ্যানিহিলেশন অব সারপ্লাস ভ্যালু প্রকৃতই হয়েছিল কী? যদি হয়ে থাকে, তা হলে চাইনেস্কুর সোনার কমোড, হোনেকারের একশটি মোটরগাড়ি, রুশ পার্টির নেতাদের রাজকীয় জীবন যাপনের বন্দোবস্ত, প্রত্যেকের জন্য দাচা—এসব কোথা থেকে এল? সারপ্লাস ভ্যালু সেখানেও তৈরি হচ্ছিল এবং এক পরগাছা শ্রেণী তার ফায়দা ওঠাচ্ছিলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখের হলেও তাঁরা হলেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আর কর্মীর দল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে: তা হলে সে সমাজের আদর্শ যদি শোষণহীন সমাজ না হয়, তা হলে সেটা কী? সোভিয়েত অর্থনীতিতে যেটা প্রাধান্য পেতে থাকে, সেটা এক ধরনের "গরিবি হটাও" জাতীয় কার্যক্রম, এবং সমস্ত অর্থনীতির নিয়মকানুন জলাঞ্জলি দিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থভাণ্ডার ক্রমশ রূপান্তরিত হতে থাকল 'দরিদ্রবান্ধব ভাণ্ডারে'। এখন, জাতি প্রকৃত অর্থে যদি সম্পদ তৈরি করতে না পারে, তা হলে কতদিন সে প্রাকৃতিক সম্পদ বিক্রি করে এবং নোট ছাপিয়ে অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখবে? সেটা সম্ভব নয়। তাই তার অর্থনীতি শুধু ভেঙেই পড়ে নি, মানুষকে শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের বিরোধী শিবিরে ঠেলে দিয়েছে। এখানে আমাদের দেশের উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মোট ২,৮০,০০০ কোটি টাকা খাটছে (কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের প্রচেষ্টা ধরে) এবং এই টাকা খাটিয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি নীট লাভ করছে ৪,৫০০ কোটি। অপরদিকে, ভারত সরকারের বর্তমানে পাবলিক ঋণ হল ১,৮২,০০০ কোটি টাকা যার জন্য সরকারের প্রতি বছর সুদ দিতে হয় ২০,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে কোনো সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না। উল্টো দিকে অবক্ষয়ের পরিমাণ ১৯৯০ সালে ১৫,৫০০০ কোটি টাকা। সমাজতান্ত্রিক দেশে একই জিনিস ঘটে আসছিল আরো বিপুল আকারে, কারণ সেখানে সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্র আরো অনেক-অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধে দিয়ে থাকে। (দ্র: *What Ails the Public Sector*, P. N. Agarwala, Survey of Indian Industry 1990. Published by *The Hindu*.)

তৃতীয় প্রশ্ন—এই সমাজব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের মানসিকতা কখনই গড়ে উঠতে পারে না। যে মানসিকতা গড়ে ওঠে সেটা ধনতান্ত্রিক দেশের মানুষ থেকে মোটেই আলাদা নয়। এ ব্যাপারে আমি প্রয়াত সমর সেনের সাহায্য নিচ্ছি, কারণ তাঁকে কেউ স্তালিনবিরোধী বা ক্রুশ্চেভপ্রেমিক বা ধনতন্ত্রের দালাল বলতে পারবেন না। তিনি রুশ দেশে গিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন সবে ক্রুশ্চেভ স্তালিনের সমালোচনা শুরু করেছেন। সমর সেন লিখছেন, 'সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতা কয়েক পাতায় লেখা যায় না। বিশেষ করে রাশিয়ার মতো বিরাট এবং নানা অর্থে বিচিত্র দেশের বিষয়ে। **তবে এমন অনেক অভিজ্ঞতা ঘটেছে, যার কথা লিখব না।** আমরা অনুবাদ করে জীবনধারণ করতাম, ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতাদের মতো অতিথি হিসেবে রাজকীয়-ভাবে থাকি নি—ভালো হোটেল, গাড়ি, দোভাষিণী ইত্যাদি ইত্যাদি। সেজন্য মুখ বন্ধ রাখবার বাধ্য-বাধকতা আমার নেই, তবে মধ্যবিত্ত ভদ্রতাজ্ঞানে লাগে। ...তবে রুশ পত্রপত্রিকাতে ক্রমাগত যে নতুন মানুষ সৃষ্টির কথা শুনেছি, সেই নতুন মানুষ চোখে পড়ে নি···এক হিসেবে রুশিরা অরাজনৈতিক। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মতো আন্দোলন না হলে বোধহয় লোকে কর্তাভজা ও অরাজনৈতিক হয়' ("বাবুবৃত্তান্ত" পৃ ৬০)। শুধু তাই নয়, 'কমবেশি রোজগারী পরিবারের অভীপ্সা ছিল আলাদা ফ্ল্যাট, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, দাচা (শহরের বাইরে বাড়ি, সেটা সরকারের সম্পত্তি নয়) ইত্যাদি, এখন বোধ হয় মোটরগাড়ি। পোটেমকিন-এর দেশে "আওয়ারা" আর রাজকাপুর নিয়ে উচ্ছ্বাসের অন্ত ছিল না, "পথের পাঁচালী" পাত্তা পেত না' (তদেব, পৃ ৬০-৬১)।

এখন কথা হল, যে সমাজব্যবস্থা এই ধরনের নতুন মানুষ' সৃষ্টি করেছে, তার জন্য ক্রুশ্চেভের পাঁচ-সাত বছরের রাজত্বকে দায়ী করা ঠিক হবে না। তাহলে দায়টা এসে পড়ে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার নেতা লেনিন এবং স্তালিন এঁদের সবারই ঘাড়ে। কাউকে বাদ দেওয়া যায় না।

চতুর্থত, দুঃখ করা হচ্ছে, মার্কস বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথবা শেষভাগে ধনতন্ত্রের কী হাল হবে বলতে পারেন নি। একথা সত্য, মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী ধনতন্ত্র তার নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে নিজেই নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনবে। কিন্তু সেই মৃত্যু কতটা ত্বরান্বিত হবে, সেটা যে নির্ভর করবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির আপেক্ষিক ক্ষমতার উপরে—একথা কি মার্কস বলেন নি? ১৮৪৮ সালে "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" লেখার পরে এবং ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পরাজয়ের পরে তিনি তার কারণ অনুসন্ধান করে, যে কথা বলেছিলেন তার মর্মার্থ:

'Immediately after the *Communist Manifesto* (in which Marx and Engels had called attention to the importance of the opening of the Indian and Chinese markets for the capitalist production) and the collapse of the 1848 revolutionary wave Marx concentrated his attention on the reasons underlying that collapse and found them above all in the new expansion of capitalism outside Emrope, into Asia, Australia and California.' (R. P. Dutt, *India Today and Tomorrow*, PPH, 1955, p 32)

এখন পরবর্তী কালে এসব চিন্তা মার্কসবাদীরা ভুলে গেলেন, এবং মার্কসবাদকে একেবারে ধর্মীয় ফতোয়াতে পরিণত করতে গেলেন কেন?

১৯১৭ সালে সবাই ধরে নিয়েছিলেন—বিশ্ববিপ্লব হল বলে, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এটা এখন প্রমাণিত সত্য। দীর্ঘদিন এই চিন্তার কবলে আচ্ছন্ন থাকায় মার্কসবাদীরা ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোনো স্ট্র্যাটেজি নিতে পারে নি—একথা অস্বীকার করা যাবে কী করে? কথায় বলে, দর্শকরাই নাকি খেলাটা ভালো দেখে, খেলোয়াড়রা নয়। ভেরা রাসেল গৃহযুদ্ধের অব্যবহিত পরে রুশদেশে যান, তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

'At this date the Russians were convinced as in fact Lenin himself, that the revolution must spread to Germany and so across Europe to Britain. Their country was in ruins, they were practically starving and Germany was in no better condition. After their bitter sufferings and their great triumphs it is inconceivable that British and German workers would not rally to their side, the day of worldwide revolution, they believed, must be at hand. Ther ignorance of the circumstanees and mood of the British workers was only equalled by the ignorance of the British about them.' (*Tamarisk Tree*, vol. I, p 87.)

এই সত্যটা তখন পৃথিবীর সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি। তবে এ নিয়ে কেউ আলোচনা করেন নি, তা নয়। ১৯২৫ সালে রুশবিপ্লবের অষ্টম বার্ষিকীতে এক বিখ্যাত নেতা এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। যদি ধনতন্ত্র পৃথিবীতে কিছুদিনের মতো স্থিতিশীল হতে পারে, তা যে কোনো কারণেই হোক, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন,

To put it more simply, it would mean we had made a mistake in the fundamental estimation of history. It would mean that capitalism had not yet exhausted its "missions" in history and that the present imperialist phase was not one of the decline of capitalism, its last convulsions but the dawn of a new prosperity for it.' (Ibid, pp 126-7)

যদি সত্যিই সেরকম অবস্থা হয়, তাহলে সমাজতন্ত্রের কী ধরনের বিপদ হতে পারে?

'Of what kind? A new war, which again would not be prevented by a "tricked" European preletariat—a war in which the enemy would oppose us with a superiority of technical resources? Or would it by an influx of capitalist goods, incomparably better and cheaper than ours, goods which would break our foreign trade monopoly and afterwards the other foundations of our capitalist economy?'

ঠিক দ্বিতীয় ঘটনাটাই আজ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতে ঘটেছে। তবে সাবধানতা অবলম্বন করা হল না কেন? কারণ,

'However there is no reasonable grounds to presume a variation of this kind, and it would be senseless first to develop a fantastically optimistic future for the capitalist world than to break our heads trying to find a way out of it.'

এ ব্যাপারে মাথা না-ঘামানোর ফল এখন হাতে-হাতে পাওয়া যাচ্ছে।

এই বিখ্যাত বিপ্লবীর নাম সকলেরই জানা—লিয় ট্রটস্কি। বইটি ইংরেজ পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। প্রকাশক মিথুয়েন অ্যানড কো লিমিটেড, লনডন। বইটির নাম *Towards Socialism or Capitalism?* তখনও তিনি বলশেভিক পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য। তাই ভরসা করে তাঁর লেখার উদ্ধৃতি দিলাম, পাছে এটাকেও না কেউ বলে বসেন প্রতিবিপ্লবী ব্যাপার।

এবার ধনতন্ত্র প্রসঙ্গে আসা যাক। ধনতন্ত্রের সংকট প্রসঙ্গে স্তালিন তাঁর শেষ বইতে যে বিশ্লেষণ করেছিলেন সেটা হল,

(a) Can it be affirmed that the thesis expounded by Stalin before the Second World War regarding the relative stability of markets in the period of general crisis of capitalism is still valid?

(b) Can it be affirmed that the thesis expounded by Lenin in the spring of 1916 —namely, that in spite of the decay of capitalism, "on the whole, capitalism is growing far more rapidly than before"—is still valid?

I think, that it cannot, in view of the new conditions to which the Second World War has given rise, both these theses must be regarded as having lost their validity.' (J. V. Stalin, Economic Problems of Socialialism in the USSR, Moscow, 1952).

এই বিশ্লেষণ কতটা সত্য, ইতিহাস তার সাক্ষী।

ধনতন্ত্রকে গতিশীল করতে আন্তর্জাতিকতা, কমিউনিস্ট আন্দোলন কতটা সাহায্য করেছে গত ২৪ বছরে, আলোচিত হওয়া উচিত। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা কবরস্থ করতে কমিউনিস্টদের উৎসাহের অভাব দেখা যায় নি। সমাজবাদী অর্থনৈতিক বাজারকে নিজেরাই মারামারি করে শেষ করে দিয়েছে, ফলে চীনের বাজার উন্মুক্ত হয়ে গেল ধনতন্ত্রের কাছে। একমাত্র চীনেই এখন খাটছে ১৮,০০০ কোটি টাকার বিদেশী অর্থ। সোভিয়েত এবং পূর্ব ইউরোপে কত দাঁড়াবে, তা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে। (Li Peng's Report, By Bhabani Sengupta in '*The Statesman*', 1 April, 1991)।

ধনতন্ত্র, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব যাই থাক না কেন, আজ অনেক বেশি "আন্তর্জাতিক" হয়ে উঠেছে। ইউরোপের দিকে দেখুন। ইউরোপ আজ এক অভিন্ন অর্থনৈতিক ইউনিটে পরিণত হতে চলেছে। ইনটারন্যাশনাল ডিভিশন অব লেবার এক অকল্পনীয় স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে। সঙ্গে তার যান্ত্রিক উৎকর্ষ। আজ কোনো







জিনিসের গায়ের ছাপ দেখে বোঝা যাবে না জিনিসটা কোথায় তৈরি হচ্ছে, বা তার প্রকৃত মালিকানা কোন্ দেশের?

When an American buys a "domestic" Pontiac car for $ 20,000 from General Motors, about $ 6000 goes to South Korea for routine labour operations, $ 3600 to Japan for advance components, nearly $ 3000 to advertising agents or data processors from Britain in Barbados. Less than $ 8000 of the original $ 20,000 goes to Americans and not of much of that to horny landed foilers : mainly to "strategists in Detroit, lawyers and bankers in New York, lobbyists in Washington, insurance and healthcare workers all over the country and General Motors shareholders an increasing number of whom are foreign national.

এখানে মনে রাখা দরকার, জেনারেল মোটরস আমেরিকার বৃহত্তম শিল্পসংস্থা। আর এই কথাগুলো ছাপা হয়েছে "দি ইকনমিস্ট" লনডন, মার্চ ২৬, ১৯৯১। সংখ্যাতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির পণ্ডিত, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রবার্ট রাইখ-লিখিত *The Work of Nations* বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে।

কাজেই ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইটা আজ আর জাতীয় স্তরে থাকছে না। লড়তে হবে আন্তর্জাতিক স্তরে, আর সেটা খুব সহজ লড়াই নয়, তাই সেদিকে মার্কসবাদী পণ্ডিতদের আরো বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন। মার্কসের 'Workingmen of all countries, unite' আজ একটা অর্থহীন ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে—কথাটার তাৎপর্য আজকে বেশি করে বুঝতে পারা যাচ্ছে। মার্কিন মূলধনকে ধরতে হলে আজকে শুধু আমেরিকাতে নয়, সারা বিশ্ব জুড়ে ধরতে হবে, সমস্ত শোষিত মানুষকে একই সঙ্গে, সবাই মিলে। সমস্যা অত্যন্ত কঠিন—এতে কোনো সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে মার্কসের বা লেনিনের মতো মহামানবের যদি আর আবির্ভাব না ঘটে, তাহলে যাঁরা মার্কসবাদী আন্দোলন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন, তাঁদেরই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। সেই দিকে সার্থকভাবে এগিয়ে যাবার জন্যই আমরা স্বাগত জানাই এই প্রচেষ্টাকে, যাতে আরো সুষ্ঠু এবং সুন্দর লেখাতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে নতুন-নতুন বই মার্কসবাদী পাঠকমহলকে চিন্তার খোরাক জুগিয়ে যেতে পারে। আলোচিত বই দুটিতে সেই খোরাক যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে, আর তাকে ঘিরেই এত কথা।

## পত্রসাহিত্য ও পত্রোপন্যাস

**অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়**

ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (জন্ম: পেয়ারাগ্রাম, চব্বিশ পরগনা, **পশ্চিমবঙ্গ**, ১০ জুলাই ১৮৮৫, মৃত্যু: ঢাকা, ১৩ জুলাই ১৯৬৯) ভারত-উপমহাদেশে শিক্ষা-সংস্কৃতিক্ষেত্রে অবশ্য উচ্চার্য নাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের গবেষণা-সহায়ক, দীনেশচন্দ্র সেনের সহকর্মী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের রীডার ও অধ্যক্ষ, পারীর সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বনিবিজ্ঞান এবং প্রাচীন ও আধুনিক ইন্দো-ইরানীয় তথা ইন্দো-আরিয়ান ভাষাসমূহে উচ্চতম ডিগ্রি-অর্জনকারী এই মহাপণ্ডিতের নাম ভারত-উপমহাদেশে বহুকাল যাবৎ

**পত্রসাহিত্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ**—আ. মু. মু. হুকল ইসলাম। ইসলামিক ফাউনডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা। বত্রিশ টাকা।

**বাংলা পত্রোপন্যাস**—অতুলকুমার দাস। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯। পঁচাত্তর টাকা।

শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে। তাঁকে খুব কাছের থেকে যাঁরা দেখেছেন এমন লোক কলকাতা ঢাকা রাজশাহী চট্টগ্রামে ছিলেন, আছেন। যাঁরা দেখেন নি তাঁরা তাঁর পরিচয় পাবেন বাঙলা ইংরেজি ফরাসি উর্দু ভাষায় লেখা খান চল্লিশেক গ্রন্থে। কিন্তু কাছের মানুষ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার আর-একটি পথ আছে। সে পথ খুলে দিয়েছেন আ. মু. মু. নুরুল ইসলাম (পাণ্ডুলিপি সম্পাদক, পত্রিকা উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা)।

তৎসম্পাদিত "পত্রসাহিত্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ" বইখানিতে শহীদুল্লাহর আশিখানি পত্র সংকলিত হয়েছে। সংকলক-সম্পাদক এই কাজটি করে বাঙলা-ভাষাপ্রেমিক শহীদুল্লাহ-অনুরাগীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। এদেশে বহু কীর্তিমানের চিঠি উপযুক্তভাবে রক্ষিত, সংকলিত, সম্পাদিত হয় না। বহু আয়াসে সম্পাদক এইসব চিঠি সংগ্রহ করেছেন। সেগুলির শ্রমসাধ্য টীকা আর তালিকা করেছেন, পত্রপ্রাপকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন, পত্ররচনাকালে লেখকের বয়সের উল্লেখ করেছেন, শহীদুল্লাহ-প্রণীত গ্রন্থরাজির তালিকা দিয়েছেন, তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়েছেন, আলোচ্যমান পত্রসমূহের প্রাপক, বিষয়বস্তু, পত্র-প্রেরণের স্থান ও তারিখের সারণী দিয়েছেন। বহু যত্ন আর আয়াসে সংগৃহীত ও সম্পাদিত এই পত্রাবলীর জন্য সম্পাদককে সাধুবাদ জানাই। নানা প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করা যাবে। বন্ধুবান্ধব, পুত্রকন্যা, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মসূত্রে পরিচিতদের লেখা এইসব চিঠিতে শহীদুল্লাহ সাহেবের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ব্যক্ত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক চিন্তার পরিচয়। শেষ জীবনের অর্থকষ্টের কথা যেমন তিনি কবুল করেছেন, তেমনি জোর দিয়েছেন তাঁর শেষ দুটি বড়ো কাজের উপর—"ইসলামী বিশ্বকোষ" আর "আঞ্চলিক ভাষার অভিধান"। শেষ পত্রে (৮০ সংখ্যক) ঢাকা থেকে ১২ অকটোবর ১৯৬৭-তে কলকাতায় তাঁর কৃতী ছাত্র অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন—'দেশান্তরে থাকিলেও যেমন জননী বদলায় না সেইরূপ জন্মভূমিও বদলায় না। আমি একবার জন্মভূমিতে গিয়ে তোমাদের দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করি কিন্তু নানা কারণে তাহা ভাগ্যে ঘটিবে কিনা জানি না।' সম্পাদক নুরুল ইসলামকে ধন্যবাদ এমন একটি সংকলন পাঠককে উপহার দেবার জন্য।

"বাংলা পত্রোপন্যাস" বইটি পশ্চিমবঙ্গের এক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সফল গবেষণা-অভিসন্দর্ভ। বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব আছে। পত্রাকারে লিখিত উপন্যাস বা পত্রগুচ্ছসমবায়ে রচিত উপন্যাসকে লেখক "পত্রো-পন্যাস" নামে অভিহিত করেছেন। এই বিশেষ-শ্রেণীভুক্ত উপন্যাস অবলম্বনে এই শিল্পরীতির পরিচয় দিয়েছেন এবং বারোখানি উপন্যাসের বিচার করেছেন। উপন্যাসগুলি হল—"বসন্তকুমারের পত্র" (নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর), "বাঁধনহারা" (নজরুল ইসলাম), "ক্রৌঞ্চ-মিথুন" (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়), "কষ্টিপাথর" (বনফুল), "সন্ধ্যাদীপের শিখা" (তরুণকুমার ভাদুড়ী), "মেমসাহেব" (নিমাই ভট্টাচার্য), "শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা-কে" (সন্তোষকুমার ঘোষ), "প্রিয়-বরেষু" (নিমাই ভট্টাচার্য), "মহুয়ার চিঠি" (বুদ্ধদেব গুহ), "নোটন নোটন পায়রাগুলি" (কেতকীকুশারী ডাইসন), "এ পরবাসে" (দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়)।

আমাদের দেশে যেমন রীতিতে গবেষণা-সন্দর্ভ রচিত হয়, তেমনভাবেই লেখক আটঘাট বেঁধে কাজটি করেছেন। এক দীর্ঘ ভূমিকা ওরফে গবেষণা-পরি-কল্পনা-পরিচায়ক ও পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভাজিত এই বইয়ে পত্রব্যবহারের নানা দিক, পত্র ও পত্রসাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য, কথাসাহিত্যের স্বরূপ, পত্রোপন্যাসের স্বরূপ, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাঙলা সাহিত্যে পত্রের ভূমিকা ও ব্যবহার, বাঙলা উপন্যাসের উন্মেষ, বিকাশ ও সমৃদ্ধি, আত্মকথনরীতির উপন্যাস, তিন প্রধান বাঙলা উপন্যাসলেখকের (বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র) পত্রোপন্যাস না লেখার সম্ভাব্য কারণ বিচারশেষে শেষ পরিচ্ছেদে উপরিলিখিত বারোটি পত্রোপন্যাসের আলোচনা। এই আলোচনায় একটি বাঁধা গত অনুসৃত। শেষে যথারীতি পরিশিষ্টে আঠারো শতকে ইংরেজি পত্রোপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ও আলোচিত বাঙলা পত্রোপন্যাসের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা। সর্বমোট পৃষ্ঠাসংখ্যা চার শ।

এর মধ্যে একমাত্র বিচার্য পঞ্চম ('ঙ') পরিচ্ছেদ যেখানে তিন প্রধানের পত্রোপন্যাস না লেখার সম্ভাব্য কারণ বিচারিত। আফশোস, সম্ভাব্য কারণ বা কারণ-সমূহ এই পরিচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয় নি। লেখকের একটিমাত্র বক্তব্য এখানে আলোচিত—'প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে পত্রোপন্যাসের রচনা-রীতির সঙ্গে আত্মকথনরীতিতে রচিত উপন্যাসের মিল আছে।'

আফশোস দুটি—(১) কেন ঔপন্যাসিকরা পত্রের আশ্রয় না নিয়ে আত্মকথনরীতির আশ্রয় নিলেন, তার ব্যাখ্যা নেই। (২) কেন প্রধান বা প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকরা পত্রোপন্যাস-রচনারীতিকে উপেক্ষা করলেন এবং কেনই-বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিকরা এদিকে ঝুঁকলেন।

## বাঙলা সাহিত্যে বীরবল প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে তিনটি গবেষণাগ্রন্থ

**সুজিৎ ঘোষ**

প্রমথ চৌধুরী তরফে বীরবলের নাম বাঙলা সাহিত্য-আলোচনায় এক স্থায়ী নাম। কবি, গল্পকার এবং প্রাবন্ধিক হিসাবে তাঁর মূল্যের সঙ্গে "সবুজপত্র"-র সম্পাদক হিসাবে বাঙলা চলিত ভাষার প্রতিষ্ঠায় প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা বিস্মৃত হবার নয়। এখনকার বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে চলিত ভাষা প্রচলিত করার জন্যে প্রমথ চৌধুরী যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তা পুরোপুরিই সফল। শুধু, সংবাদপত্রের দু-একটি সম্পাদকীয় আর বিয়েবাড়ির কিছু চিঠিতেই 'সাধু' ভাষা টিকে থাকছে, অবশ্য তাতেও সাধু-চলিত-মিশ্রণপ্রমাদ মধ্যে-মধ্যে চোখে পড়ে। তাঁর 'রায়তের কথা'য় সাধারণ মানুষের পক্ষে যে তত্ত্বগত অবস্থান, মুখের ভাষাকে সাহিত্যের অঙ্গনে চালানো সেই তত্ত্বগত অবস্থানেরই, বলা চলে, প্রয়োগগত দিক। অবশ্য, প্রমথ চৌধুরীর এই চলিত ভাষাও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা নয়, এ ভাষা শিল্পিত। কিন্তু ক্রিয়া আর সর্বনামের চলিত ব্যবহার প্রমথ চৌধুরী তথা "সবুজপত্র" গোষ্ঠীর ভাষাকে সাধু ভাষার থেকে সাধারণ মানুষের নিকটতর করেছে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমথ চৌধুরীর "প্রবন্ধসংগ্রহে"র ভূমিকায় বলেছিলেন যে, তিনি 'যে রচনারীতি এনেছেন, বাংলা সাহিত্যে তা নূতন। বিষয়বৈচিত্র্যের অবধি নেই। ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সভ্যতা, প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস, সমাজ পলিটিক্স, চিরন্তন ও সাময়িক সকলের সেখানে স্থান। নানা জ্ঞান ও বিদ্যার অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ করেছেন যেন সহজ ঘরোয়া কথায়···আর, সকল আলোচনাকে অনুস্যূত করে আছে এক দীপ্তি-মান রসিকতার সুতীক্ষ্ণ সরসতা।'—এই মূল্যায়ন সত্ত্বেও, প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুর পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যেই তাঁর প্রবন্ধের ঐশ্বর্য অনুধাবন করার মতো

---

**বীরবল ও বাংলা সাহিত্য**—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যলোক। পঁয়ত্রিশ টাকা।

**রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়**—জ্যোতির্ময় ঘোষ। নবার্ক। চল্লিশ টাকা।

**চার ভুবনের কিনারে**—অজিতকুমার চক্রবর্তী। দে বুক স্টোর। পনেরো টাকা।

**রবীন্দ্রসাহিত্যে ভূত্যের স্থান ও মানবতাবাদ**—রামপ্রসাদ পাল। দে বুক স্টোর। চল্লিশ টাকা।

পাঠকসংখ্যা কমছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাঙলা স্নাতক আর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রমথ চৌধুরীর কিছু প্রবন্ধ বা কবিতা পাঠ্যতালিকাভুক্ত। এবং শিক্ষক আর ছাত্র-দের কাছে মুক্তমনে সমীক্ষা করলে স্পষ্ট হবে যে, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ও বাঙলা প্রশ্নপত্রে তাঁর অনিবার্য উপস্থিতি সত্ত্বেও, ছাত্রছাত্রীরা 'বিকল্পে'-র সুযোগ পেলে প্রমথ চৌধুরীকে এড়িয়ে চলতে চায়। প্রকৃতপক্ষে, যে শৈলীগুণে একদা তিনি আদৃত, একালের পাঠকের কাছে তা জটিল, কখনও বা অতি-কথন বলে মনে হয়। তাঁর "সনেট পঞ্চাশৎ" পাঠকের কাছে দুর্লভ। কিন্তু "গল্পসংগ্রহে" এখনও পাঠক মনঃসংযোগ করলে যে সাহিত্যপাঠের আনন্দ পেতে পারেন, তাতে কোনো সংশয় নেই। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের "বীরবল ও বাংলা সাহিত্যে"র তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে—১৯৬০ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে তিনটি সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে, ১৯৬৮ সালে। বিশ বছর যাবৎ গ্রন্থটি অমুদ্রিত থাকায় ছাত্র-পাঠকদের অসুবিধে হচ্ছিল, কলেজ-গ্রন্থাগারগুলিতে প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণের জীর্ণপ্রায় কপির জন্যে সারি দিতে দেখেছি। এগারোটি অধ্যায়ে প্রমথ চৌধুরী আলোচিত হয়েছেন। সময়-পরীক্ষিত পঠন-পাঠনে সহায়ক গ্রন্থটি বর্তমানের তুলনায় দামও কম। প্রচ্ছদ সুন্দর।

"রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়" নামক জ্যোতির্ময় ঘোষের গ্রন্থটিও বিশ বছর পরে দ্বিতীয় মুদ্রণে প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথের 'করুণা', 'রাজর্ষি', বউ-ঠাকুরানীর হাট' ও 'মুকুট'—এই চারটি উপন্যাসের আলোচনা। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখো-পাধ্যায়, সুকুমার সেন, সজনীকান্ত দাস এবং আরও অনেকে "করুণা" অসমাপ্ত গ্রন্থ বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক ঘোষ ১৯৬৯ সালেই প্রমাণ করে-ছিলেন যে "করুণা" সমাপ্ত হয়েছিল—এ তথ্য আবিষ্কারের জন্যে তিনি প্রভাতকুমার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কানাই সামন্ত প্রভৃতি বহু বিদ্বজ্জনের প্রশংসা ও ডক্টর উপাধি লাভ করেন। রবীন্দ্র-জীবনীর পরবর্তী অগ্রগণ্য গবেষক প্রশান্তকুমার পালও অধ্যাপক ঘোষের মতকেই গ্রাহ্য করেছেন। বর্তমান মুদ্রণে শ্রীঘোষ 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' প্রথম মুদ্রণের যাঁরা প্রশংসা করেছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা দিয়েছেন—প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিশির চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন, প্রবোধচন্দ্র সেন, কানাই সামন্ত, বিভূতি চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ভবতোষ দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, সোমেন্দ্রনাথ বসু, ভূদেব চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র মৈত্র, ক্ষেত্র গুপ্ত, রবীন্দ্র গুপ্ত, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সত্যব্রত দে, পবিত্র সরকার, পিনাকেশ সরকার প্রমুখ—সকলেই বাঙলা পঠনপাঠন-জগতের খ্যাতিমান ব্যক্তি। সুতরাং এই গ্রন্থের ওপর অধিক বাক্যব্যয় অনাবশ্যক। অধুনা ইউ. জি. সি নামক সংস্থার নিয়মানুসারে, অধ্যাপকের অবশ্যলভ্য পি.-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভের বাধ্যবাধকতার যুগে, পি-এইচ ডি.-প্রার্থীরা এ-গ্রন্থটি পাঠ করলে বুঝতে পারবেন যে, গবেষণার ক্ষেত্রে গভীর ও ব্যাপক উপাদান ছাড়াও সীমিত ক্ষেত্রে নতুন তথ্যের আবিষ্কারও প্রশংসা ও স্মরণীয় সাফল্য এনে দিতে পারে। এই নবার্ক সংস্করণের ছাপা-বাঁধাই, প্রচ্ছদ সুন্দর।

অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তীর "চারভুবনের কিনারে" গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের "অচলায়তন", "মালঞ্চ", "গল্পগুচ্ছ" ও "নবজাতক"—এই চারটি বিভিন্ন আঙ্গিকের গ্রন্থই অজিতবাবুর আলোচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের এই চারটি গ্রন্থই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক স্তরের পাঠ্য। অজিতবাবু এই গ্রন্থভুক্ত চারটি প্রবন্ধ সেই স্তরের পাঠকের কথা মনে করেই লিখেছেন, এবং 'সূচনা'য় বলেছেন, 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বাঙলা





অনার্সের জনৈকা ছাত্রীর স্নেহের দাবী, আগ্রহ ও প্রয়োজনানুসারে কয়েকটি রচনার বক্তব্য প্রভৃতভাবে প্রবৃদ্ধ ও প্রসারিত করা হয়েছে, ফলে অবর্জনীয়ভাবেই ঘটেছে কিছু পুনরুক্তি।' অজিতবাবুর অতিরিক্ত কোনো দাবি নেই। প্রবন্ধগুলিকে যেভাবে আবার বিভাগ-উপবিভাগে গ্রন্থিত করা হয়েছে, তাতে লেখকের উদ্দিষ্ট পাঠকরা লাভবান হবে। নানা প্রাসঙ্গিক তথ্যের সমাবেশে অজিতবাবু সহজবোধ্য ভাবেই লিখেছেন।

রামপ্রসাদ পালের "রবীন্দ্রসাহিত্যে ভৃত্যের স্থান ও মানবতাবাদ" গ্রন্থটিও একটি পি.এইচ. ডি গবেষণা-পত্র। রবীন্দ্রসৃষ্টিসম্ভারে যে অনন্ত গবেষণাযোগ্য উপাদান রয়ে গেছে, আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়টি আমাদের সে কথাই স্মরণ করায়। ভূমিকাসহ সাতটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা-গান ও প্রবন্ধপত্রাদিতে 'ভৃত্য' ও দাসীদের উপস্থিতি ও সেখানে মানবিক সম্পর্ককে লেখক দেখাতে চেয়েছেন। 'ভৃত্যপরিবৃত সামন্ততান্ত্রিক প্রভু-পরিবারের জাতক এবং স্বয়ং প্রভু হয়ে নানাজাতীয় এবং বহু-সংখ্যক ভৃত্যের সান্নিধ্যে এসে তাদের নিবিড় পরিচয় লাভ করেছিলেন'—রবীন্দ্রনাথ, লেখকের এ-বক্তব্য তথ্যভিত্তির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু, এই ভৃত্যদের 'টাইপ' বিভাজন করতে গিয়ে সপ্তম এবং 'বিবিধ'—এই আটটি শ্রেণীবিভাগে গৃহভৃত্য ও দাসী ছাড়াওরাজসেনাপতি, জমিদারের দেওয়ান-ম্যানেজার, প্রহরী-দেহরক্ষী, মালী, দূত, গুপ্তচর, বিদূষক, কঞ্চুকী, —এমনকী "বিসর্জন" নাটকের জয়সিংহকেও লেখক ভৃত্যশ্রেণীভুক্ত করেছেন। ফলে, সামন্ততন্ত্রের বা অন্য কোনো 'তন্ত্রে'র রাষ্ট্রব্যবস্থার বিবিধ রক্ষকরাও 'ভৃত্য' সংজ্ঞায়িত এক অতিব্যাপ্ত অর্থ পেয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য চরিত্রসৃষ্টি রহস্যকে' 'সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শ, শেক্সপীয়রের মানবতাবাদ ও কবির বিশাল জীবন-ব্যাপী অভিজ্ঞতা'—এই ত্রিভুজ-আকৃতিতে লেখক ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। শেক্সপীয়র ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিবিধ উদাহরণে লেখকের অধ্যয়নের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু, বিষয়গত অঙ্গ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-সমস্ত প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রেখেছেন তাতে নানা অসঙ্গতা এবং ভ্রম ধরা পড়ে। লেখক মার্কসকথিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র কথা বলেছেন (পৃ xxvi) এবং বলেছেন 'এখানে প্রাচীনকালে সামন্ততন্ত্র ছিল না। মুসলমান আমলে সামন্ততন্ত্রের সূত্রপাত।' —কোন্ প্রাচীনকালে? অন্যদেশে, ইউরোপে কি প্রাচীনকালে সামন্ততন্ত্র ছিল? ডি. ডি. কোসাম্বী, আর. এস. শর্মা প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তো "মুসলমান" আমলের বহুপূর্বে এদেশে সামন্ত-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করেছেন। ইরফান হাবিব, গৌতম ভদ্রের মতো ইতিহাসবেত্তারাও বলেছেন যে "মুসলমান" আমলে পূর্ববর্তী সামন্ততন্ত্র আরো নিয়ম-বদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়েছে। একই ধরনের ইতিহাস-চেতনার অভাবে 'ভারতীয় রেনেসাঁস চেতনায়, সনাতন ভারতের ট্রাডিশনগত আদর্শ এবং পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শ-জাত মানবিক মূল্যবোধের মিশ্রণ ঘটেছিল' (পৃ iii) বলা হয়েছে। 'বেঙ্গল রেনেসাঁসে'র যাথার্থ্য নিয়েই বিতর্কের মীমাংসা হয় নি আজও। আর 'ভারতীয় রেনেসাঁস' কী বস্তু তা বোঝা গেল না। এই একই রাজনৈতিক-মতাদর্শগত ধারণার অসঙ্গতায় 'বিশেষ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি' (পৃ xxvi) এবং 'মানবতাবাদ'কে লেখক একাকার করে ফেলেছেন। মানবিক দৃষ্টি-ভঙ্গি মানুষের সমস্ত মহৎ সৃষ্টির মধ্যেই প্রাপ্তব্য। কিন্তু "মানবতাবাদ" বিশেষ আর্থ-সামাজিক-রাজ-নৈতিক-মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গিজাত। এই ধরনের ভ্রান্তির ফলে গ্রন্থনামে "মানবতাবাদ" শব্দটি থাকলেও, আলোচ্য গ্রন্থে মানবতাবাদের তত্ত্বগত প্রাসঙ্গিকতা অনালোচিত। মানবতাবাদে মানুষে-মানুষে যে সাম্যের ধারণা নিহিত, সেখানে সামন্ততান্ত্রিক প্রভু-ভৃত্যের এমনকী 'মানবিক' সম্পর্কও স্বীকৃতি পায় না। আর, রবীন্দ্রনাথ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে

নয়া সামন্ততন্ত্রের' যুগে জন্মেছিলেন ঘটনাচক্রে, কিন্তু দীর্ঘ চলিষ্ণু জীবনকালে সূচনাতেই তিনি থেমে থাকেন নি, স্বদেশ ও বিশ্বের ক্রমপরিবর্তনে তিনি নিজেরও ক্রমাগত রূপান্তর ঘটিয়েছেন।

প্রভুকর্তৃক নিপীড়িত হয়েও প্রভুর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকার মনস্তাত্ত্বিকতাকে শ্রীপাল 'মনোবিকলনের পরিভাষায় ধর্ষকাম ( sadism ) বা নিষ্ঠুরতাপ্রীতি' বলেছেন। তাই কি? না-কি পরিভাষাটি মর্ষকাম ( masochism )? গ্রন্থের শেষে 'গ্রন্থপঞ্জী' 'নির্ঘণ্ট' থাকলে পাঠকের সুবিধা হত। এতৎসত্ত্বেও গ্রন্থটিতে লেখকের পরিশ্রম ও অনুপুঙ্খ রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠের পরিচয় রয়েছে।

## বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

**অমিতাভ রায়**

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথের জন্মসাল হিসেবে এই বছরটি আমাদের বিশেষ পরিচিত। প্রখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকার, যশস্বী সাহিত্যসেবী ও সম্পাদক জলধর সেন, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মহান দেশপ্রেমিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ এই বছরটিতেই জন্মগ্রহণ করেন। এই ১৮৬১তেই মাইকেল মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রথম প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ বাঙলার জাতীয় জীবনে একটি উজ্জ্বল বর্ষরূপে স্বীকৃত। এবং এই উজ্জ্বল

**রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়**—ড. বিমলেন্দু মিত্র। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা-৯। পঁচিশ টাকা।

**বাংলাদেশে বিজ্ঞানচিন্তা** ( বিজ্ঞানবিষয়ক নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন )—আবদুল্লাহ আল-মুতী সম্পাদিত। মুক্তধারা, ৭৪ ফকিরাপুল, ঢাকা। একশ টাকা।



বছরেই জন্মগ্রহণ করেন বাঙালির বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

যশোর জেলার রাড়ুলি-কাটিপাড়া গ্রামে ( বর্তমানে বাংলাদেশের খুলনা জেলায় গ্রামটি অবস্থিত ) ১৮৬১-র ২রা অগস্ট হরিশ্চন্দ্র রায় ও ভুবনমোহিনী দেবীর তৃতীয় পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যোৎসাহী ও উদারমানসিকতাসম্পন্ন মাতা-পিতার উৎসাহে প্রফুল্লচন্দ্র শৈশব থেকেই পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্যান্য বহুবিধ বিষয় পড়ার সুযোগ পেয়ে যান। শৈশবে পিতা হরিশ্চন্দ্রপ্রতিষ্ঠিত রাড়ুলি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু হলেও পরবর্তী কালে প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতার হেয়ার স্কুলে পড়াশোনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সন্তানদের সুশিক্ষার জন্য হরিশ্চন্দ্র ১৮৭০ সালে স্থায়িভাবে কলকাতা ১৩২ আমহার্স্ট স্ট্রীটে বসবাস শুরু করেন। [ এই সময় থেকেই রায়-পরিবারের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তবে, একমাত্র প্রফুল্লচন্দ্রই কলেজে ঢোকার সময় ১৮৭৮-৭৯ সালে নাগাদ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। ] শারীরিক অসুস্থতার জন্য হেয়ার স্কুলের শিক্ষা ব্যাহত হয়। ফলে, ১৭৭৪-এ অ্যালবার্ট স্কুলে ভরতি হতে হয়। এখান থেকেই তিনি ১৮৭৮-৭৯ সালে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিট্যুশনের কলেজ বিভাগে 'ফার্স্ট আর্টস' ক্লাসে ভর্তি হন। এই কলেজে তখন ইংরেজি গদ্য পড়াতেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে, সুরেন্দ্রনাথ 'রাষ্ট্রনায়ক' নামে বিখ্যাত হন। বি. এ. ক্লাসের ছাত্র হিসেবে প্রফুল্লচন্দ্র গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। এই বৃত্তি পাবার জন্য চারটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন ছিল। এবং কঠিন পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে এই বৃত্তি পাওয়া যেত। প্রফুল্লচন্দ্র প্রথম ভারতীয় ছাত্র যিনি এই বৃত্তি লাভ করেন। অবশ্য একই বছরে বাহাদুরজী নামক জনৈক পার্শী ছাত্রও গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করেন। গিলক্রাইস্ট বৃত্তি নিয়ে পড়বার





উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সালে প্রফুল্লচন্দ্র ইংল্যানডে রওনা হন এবং স্কটল্যানডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এসসি ক্লাসে ভরতি হন। এই পর্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্রর জীবনী আমাদের অপরিচিত নয়। জি. সেনগুপ্ত কর্তৃক ( এন বি টি প্রকাশিত ) ইংরেজিতে লিখিত ও বহুল-প্রচারিত "পি সি রায়" নামক পুস্তকে এবং শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও অমিতাভ সেন সম্পাদিত "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ; সাম অ্যাসপেক্টস অব হিজ লাইফ অ্যানড ওয়ার্ক" ( ইনডিয়ান সায়েন্স নিউজ সার্ভিস ) নামক পুস্তকটিতে এই সমস্ত ঘটনা ইতিপূর্বেই বিবৃত। যেমন, আমরা জানতাম এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এসসি পড়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টর আহূত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায়—যার বিষয়বস্তু ছিল "সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে ভারতবর্ষ",—প্রফুল্লচন্দ্রর প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য বলে স্বীকৃতি পায়। যদিও এই প্রবন্ধে ব্রিটিশ সরকারের যথেষ্ট সমালোচনা ছিল। এরকম বহু ঘটনাই আমাদের জানা ছিল।

কিন্তু "রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়" পুস্তকটির প্রয়োজন ছিল। প্রখ্যাত অধ্যাপক বিমলেন্দু মিত্র মহাশয় বাঙালি পাঠকের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় স্বল্প পরিসরে এদেশে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক রসায়ন-বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক এবং আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বহুব্যাপ্ত জীবনকে উপস্থাপিত করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্রর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার তথ্যসমৃদ্ধ এই বইটি শুধুমাত্র সময়োপযোগীই নয়, বাঙলার জীবনীসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বহুবিধ জ্ঞাত তথ্যকে দুই মলাটের মধ্যে একত্রিত করার জন্য অধ্যাপক মিত্র বাঙালি পাঠকের প্রশংসার্হ হয়েছেন।

আরও একটি কারণে বইটির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা গেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিবৃত তথ্যসমূহকে আরও একবার ঝালিয়ে নেওয়া গেল। আমাদের কি মনে ছিল, ১৮৯৬ সালে প্রফুল্লচন্দ্র মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করেন? আমাদের কি স্মরণ আছে, ১৯০২ সালে তিনি তাঁর "হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি" প্রকাশিত হয়? আমাদের কি স্মরণ আছে, ১৯০৭-এর বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র? আমাদের কি খেয়াল আছে, এদেশে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা করেন রসায়নাচার্য? আমাদের কি সেই প্রফুল্লচন্দ্রকে মনে পড়ে যিনি এদেশে শিক্ষার সাধারণীকরণের পক্ষে প্রথম যুগের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন? উৎকল রাজ্য কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে আমাদের মনে পড়ে?

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বহুব্যাপ্ত জীবনের বহু কথাই আমাদের মনে থাকে না। "রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়" পুস্তকে অধ্যাপক মিত্র এসব তথ্যকে এক জায়গায় জড়ো করে দিয়েছেন। পাশাপাশি, কিছু নতুন তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে। যেমন,—বাঙলার নীলচাষীরা এদেশে প্রথম অহিংস সত্যাগ্রহ করেন ; গান্ধীজী-কর্তৃক চরখা প্রবর্তনের ৭৫ বছর আগে এইচ. টি. কোলব্রুক চরখা ব্যবহারের আহ্বান জানান। এ ডনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন লিখিত প্রবন্ধটি 'ই অ্যাণ্ড এস লিভিংস্টোন' নামক প্রকাশক পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিল। এই পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ বিতরিত হয়। তবে দ্বিতীয় সংস্করণ সাধারণ্যে বিক্রির ব্যবস্থা ছিল।

প্রচুরতথ্যসমৃদ্ধ এহেন পুস্তকটি সুসম্পাদিত হলে তৃপ্তি পাওয়া যেত। অধিকাংশ তথ্যসূত্র উল্লিখিত হলেও বহু গুরুত্বর তথ্যসূত্র অনুল্লিখিত। পুনরাবৃত্তি-দূষণ না থাকলে ভালো লাগত। কিছু-কিছু উদাহরণ প্রয়োজন ছিল। যেমন, সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রফুল্লচন্দ্রর অবদান উদাহরণসহযোগে বিশ্লেষণ করা যেত। অধ্যাপক মিত্র জানিয়েছেন যে, বেঙ্গল কেমিক্যাল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'প্যারিক লিমিটেড'-এ রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ১৮৯২-এ সংস্থাটির প্রতিষ্ঠার খবর অনুচ্চারিত।

আশা করি, বইটির পরবর্তী সংস্করণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র-র প্রবন্ধ, পুস্তকের পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংযুক্ত হবে; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ, পুস্তকের তালিকা সংযোজিত হবে।

পরিশেষে একটি সংশোধন: ২৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ১৮৭৩-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইতিহাসানুযায়ী ১৮৫৫-র ১৫ই জুন প্রেসিডেন্সি কলেজ নাম নিয়ে ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ কাজ শুরু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৫ই এপ্রিল, ১৮৫৫ হিন্দু কলেজ-এর কাজকর্ম বন্ধ হয়েছিল। [প্রেসিডেন্সি কলেজ, ক্যালকাটা—সেনটিনারি ভলিউম, ১৯৫৫, পৃ ৫]।

বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভূত হবার পর প্রায় দুই শতাব্দী অতিবাহিত হতে চলেছে। বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা, প্রচুর প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বাঙলায় বিজ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতা আজও নিরবিচ্ছিন্ন। উনিশ শতকের গোড়ায় এহেন প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মাদির যাত্রাশুরুর পর থেকে একাদিক্রমে দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকে সমৃদ্ধ হয়ে একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হবার প্রাক্‌মুহূর্তে বলা যায়,—বাঙলা ভাষার এই বিশিষ্ট শাখা আজ স্বীয় সম্পদে স্বীকৃত।

বাঙলায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বরাবরই দুটি ধারা বর্তমান: বিজ্ঞানবিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা এবং বিজ্ঞানের জটিল-কঠিন তত্ত্ব ও তথ্যকে সহজ-সরল ভাষায় জনপ্রিয় ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ। প্রথম বিষয়টি বিভিন্ন কারণে বিজ্ঞানী-মহলে উৎসাহ সঞ্চার করতে সক্ষম না হলেও সহজবোধ্য পদ্ধতিতে বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনার মতো কঠিন কাজটি বর্তমানে দীর্ঘ সময়ের অভ্যাসে উল্লেখযোগ্য রকমে উজ্জ্বল।

জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থান অন্তরায় নয়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দেশ বা সমাজের ভৌগোলিক বিভাজন সম্ভব হলেও সংস্কৃতি-সৃজনশীল ক্রিয়াকাণ্ডর কি বিভাজন সম্ভব?

ভারতবর্ষের কোনো নাগরিকের পক্ষে এদেশে বাঙলায় বিজ্ঞানচর্চার আধুনিকতম অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখা দুরূহ নয়। দেশান্তরে, সীমানার ওপারে অর্থাৎ বাংলাদেশে বাঙলা ভাষার এই বিশেষ শাখাটি কিভাবে লালিত-পালিত হচ্ছে—তা জানা কিঞ্চিৎ কঠিন। অথচ বিজ্ঞান এবং বাঙলা ভাষার স্বার্থে ই এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহৃত হওয়া প্রয়োজন।

স্বনামখ্যাত অধ্যাপক আবদুল্লাহ অল-মুতী সম্পাদিত "বাংলাদেশে বিজ্ঞানচিন্তা" নামক বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধসংকলন প্রকাশিত হওয়ায় এবং এদেশে এসে পৌঁছানোয় সীমানার ওপারে বাঙলায় বিজ্ঞান-চর্চার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব হল।

বিশ্বলোক, বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ, জীবন ও বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের পটভূমি এবং প্রয়োগ প্রসঙ্গ—এই পাঁচটি পর্যায়ে পুস্তকটিতে একুশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।

বিস্তারিত বিশ্লেষণ শুরুর আগে একটি মৌলিক এবং প্রাসঙ্গিক সমস্যার সমাধান করে নেওয়া দরকার। কেন বাঙলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজন? দুভাগে প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা ভালো। প্রথমত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমাজপরিবর্তনের হাতিয়ার। দ্বিতীয়ত, কোনো উন্নত, আত্মসচেতন জাতি মাতৃভাষা ব্যতিরেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার কথা চিন্তাও করতে পারে না। এবং উন্নত জাতিসমূহ উন্নত হওয়ার বহু আগে থেকেই মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে আসছে। সুতরাং বাঙলায় বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

"বিশ্বলোক" শিরোনামের প্রথম পর্বে চারটি প্রবন্ধ পরিবেশিত হয়েছে। অসীমের সন্ধানে বৈজ্ঞানিক (কাজী মোতাহার হোসেন)। বিশ্বের পরিণতি (মোহাম্মদ আবদুল জব্বার) ও জ্যোতির্বিদ্যা (আবদুল্লাহ আলমুতী) শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধে সৌর-





জগৎ, পৃথিবী তথা জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে একটি সুন্দর রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সহজ ভাষায়, সরল ভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি ব্যাখ্যা করার সময় কখনও মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাপ্রক্ষেপণের কাজে বিচ্যুতি ঘটে নি। আবার যুক্তি-তর্ক-তত্ত্ব কখনও প্রবন্ধাবলীর সাবলীলতাকে স্তব্ধ করে নি। একটি উদাহরণ দেখা যাক। 'ঘটেছিল ১৫১৭ সালে মেক্সিকোতে এক ধূমকেতুর আবির্ভাবে। আজটেক সম্রাট মকটেজুমা প্রাচীন সংস্কারের বশে ভাবলেন তাঁর রাজ্যের জন্য ঘনিয়ে এসেছে এক চরম দুর্যোগ। এই হতোদ্যমের সুযোগ নিয়ে স্পেনীয় অভিযাত্রী হারমান কর্টেজ মাত্র চারশ সশস্ত্র সেনা নিয়ে ধ্বংস করলেন দশ লক্ষ অধিবাসীর প্রাচীন সভ্যতাকে।' কুসংস্কারের বিরোধিতা করার জন্য যুক্তি-তর্কর জটিল জালবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা-বোধ হয় সর্বদা উপযুক্ত নয়। প্রথম পর্বের শেষ প্রবন্ধ বিপ্লবী জ্যোতির্বিজ্ঞানী (তপন চক্রবর্তী)। কোপার্নিকাস-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য। আগের তিনটি প্রবন্ধের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চতুর্থ প্রবন্ধটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর জীবনকথা বিবৃত করা সঙ্গত, এবং এর ফলে সামগ্রিকভাবেই প্রথম পর্ব কুসংস্কারবিরোধী মেজাজ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় পর্বের শিরোনাম—বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ। চারটি প্রবন্ধর সমাহার। বাংলা ও বিজ্ঞান (মুহাম্মদ কুদরত-এ-খুদা), বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ (এ. এম. হারুন-অর রশীদ), বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডল ও বিজ্ঞানচর্চা (আবদুল হালিম) এবং বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চা (অজয় রায়)। এই চারটি প্রবন্ধ একই সঙ্গে (১) বাংলাদেশ, (২) বাঙলাদেশের সম্পদ, (৩) বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রেক্ষাপট ও পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সম্যক পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বহুবিধ যুক্তিতর্ক ও উদাহরণ সহযোগে প্রখর বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে বাঙলাদেশের মতো দারিদ্র্যপীড়িত দেশে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রমাণ করা হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক প্রতিকূলতা, আধুনিক শিল্পব্যবস্থার অসমৃদ্ধি এবং কৃষিব্যবস্থা যথার্থরূপে বিকশিত না হওয়ার ফলে কৃষিপণ্য যথাযথ মূল্য পায় না,—এহেন তিন রকম মৌলিক সমস্যাকে স্বীকার করে নিয়েও বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চা কতটুকু সাফল্যর আলো দেখেছে এবং এখনও কত প্রতিবন্ধকতা ভাঙতে হবে, তার বিবরণ পাওয়া যায় আলোচ্য প্রবন্ধচতুষ্টয়ে। এবং এই কঠিন সাধনায় ব্রতী হওয়ার কারণ হিসেবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে—'যদি ধরে নেয়া হয় যে প্রতি দশ বছরে মানুষের জ্ঞান দ্বিগুণ হবে, তা হলে আগামী কয়েক বংশধরদের জীবনে যে জ্ঞান সঞ্চিত হবে তার পরিমাণ অবিশ্বাস্য। ১৯০০ সাল পর্যন্ত অর্জিত মানুষের জ্ঞানসমষ্টিকে এক ধরে নিলে, ২০০০ সালে তার পরিমাণ হবে এক হাজার এবং একবিংশ শতাব্দীর শেষে তা হবে দশ লক্ষ। এই অবিশ্বাস্য জ্ঞানবিস্ফোরণের দিনে আমাদের নেপথ্য-বাসিনী, অবগুণ্ঠনবতী বাঙলা মায়ের কি অবস্থা হবে?' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাঙলাভাষাভাষীর সংখ্যা বিশ্বের অন্যান্য ভাষাভাষীর তুলনায় পঞ্চম। সুতরাং লেখক-দের দৃঢ় প্রত্যয় দারিদ্র্য ও প্রাসঙ্গিক দুর্বলতাকে স্বীকার করে নিয়ে স্বীয় সম্পদের প্রকৃত ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশে ও বাঙলাভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার ব্যাপক প্রয়োজন।

"জীবন ও বিজ্ঞান" শীর্ষক তৃতীয় পর্যায়ে গ্রথিত পাঁচটি প্রবন্ধে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পাঁচটি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সম্ভাবনার নিয়ম (জহুরুল হক), হাওয়া খাওয়া (আবদুল হক খন্দকার), চিকিৎসাঙ্গনে উন্নত প্রযুক্তি: কিছু সমস্যা (আহমদ রফিক), নাম তার ক্যামেলিয়া (নওয়াজেশ আহমদ) স্বাস্থ্যরক্ষায় দই (শুভাগত চৌধুরী)—এই পাঁচটি প্রবন্ধেই সহজ ভাষায় সরল ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত কয়েকটি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

পুস্তকটির চতুর্থ পর্যায়ের শিরোনাম "বিজ্ঞানের পটভূমি" এবং এই পর্বের উপকরণ হল চারটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলি হল,— শিল্পবিপ্লব ও অনুন্নত দেশে বিজ্ঞান (আলী আসগর), বিজ্ঞানে বিশ্বাস করা কেন? (মুহাম্মদ ইব্রাহিম), বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রসঙ্গ (ক্ষেত্র বড়ুয়া) এবং আইনস্টাইন: শতবর্ষের আলোকে (শাহজাহান তপন)। সর্বসাধারণের পক্ষে বোধগম্য পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের প্রয়োজনীয়তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ আলোচ্য প্রবন্ধসমূহে করা হয়েছে। প্রবন্ধচতুষ্টয় একই পর্যায়-ভুক্ত হবার কারণ প্রতিটি প্রবন্ধেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ঐতিহাসিক-সামাজিক-দার্শনিক-অর্থ নৈতিক পটভূমি আলোচিত।

পঞ্চম তথা শেষ পর্যায়ের শিরোনাম,—প্রয়োগ প্রসঙ্গ। বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষায় বাংলাভাষা (শাহ্ ফজলুর রহমান) বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জনঘনিষ্ঠতা (দ্বিজেন শর্মা), বিজ্ঞানচর্চা ও কুদারত-এ-খুদা (নুরুল হুদা) এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ—তৎপরতা ও আমরা (জাকের হোসেন) শীর্ষক চারটি প্রবন্ধ শেষ পর্যায়ে অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজ-বাঙলাভাষা-বিজ্ঞান এই প্রকার মৌলিক বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এই প্রবন্ধগুলিতে বিবৃত। সমগ্র সংকলনটিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধগুলির প্রয়োজন ছিল। সর্বোপরি এই চারটি প্রবন্ধই কিছু সাধারণ মৌলিক প্রশ্নের জবাব দিয়েছে।

বাংলাদেশের একুশজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসক-অধ্যাপক-প্রযুক্তিবিদ্ বাঙলা ভাষায় প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় বিভিন্ন সময়ে যে প্রবন্ধসমূহ রচনা করেছিলেন, তাদের সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে দুই মলাটের মধ্যে একত্রিত করে সম্পাদক বাঙলা ভাষার পাঠকের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

"একদিন আমি দেখেছিলেম" নিবন্ধের লেখক ড. সিনাকী ভাদুড়ী রবীন্দ্র-গবেষণাকেন্দ্র কলকাতার "টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট"-এর সঙ্গে জড়িত। রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনায় তার পর্যবেক্ষণ গভীর এবং মৌলিক।



## মতামত

১

### প্রসঙ্গ উপসাগরীয় সঙ্কটের পটভূমি

"চতুরঙ্গ"-র মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত "উপসাগরীয় সঙ্কটের পটভূমি" শীর্ষক নিবন্ধটি পড়ে মনে কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে :

১। ইরাক তেলের একচেটিয়া কারবারি হয়ে দাঁড়ালে তেলহীন দেশগুলির কী উপকার হত?

২। ইজরায়েলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি না দিয়ে অধিকাংশ আরব দেশ আগেই রাষ্ট্রসঙ্ঘকে অমান্য করেছে; তাহলে তৎপরবর্তী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ রূপায়নে ইজরায়েলের নৈতিক দায়িত্ব কোথায়?

৩। ব্রিটেন-ফ্রান্স-আমেরিকা যদি হিটলারকে তৈরি করে থাকে, তাহলে স্তালিন ১৯৩৯-এর অগস্টে ও সেপটেম্বরে হিটলারের সঙ্গে যথাক্রমে অনাক্রমণচুক্তি ও মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন কেন?

এই প্রশ্নগুলির যুক্তিযুক্ত ও আবেগহীন উত্তর আগামী কোনো সংখ্যায় প্রকাশিত হলে বিশেষ বাধিত হব।

সৌমিত্র প্রামাণিক
জাঁকা, মেদিনীপুর

### লেখকের উত্তর

সৌমিত্র প্রামাণিক চিঠিতে (২২ মার্চ, ১৯৯১) তিনটে প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন। এবং উত্তরগুলো যাতে "যুক্তিযুক্ত ও আবেগবিহীন" হয়, এমন আকাঙ্ক্ষাও করেছেন। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা হয়তো এমন একটি ধারণা থেকে প্রকাশ পেতে পারে যে আলোচ্য রচনাটির ভেতর যুক্তির অভাব এবং আবেগের আতিশয্য ছড়িয়ে আছে। নতুবা, উত্তরগুলোও কেমন-ভাবে দিতে হবে তা পত্রলেখক এমন নিঃশঙ্কচিত্তে জানাতেন কিনা, বলা সংশয়। লেখাটি সৌমিত্রবাবুর পড়ে যদি সত্যিই এমন ধারণা হয়ে থাকে, তবে সেটি বিশদ করলে বাধিত হতাম। "যুক্তির অভাবকে" সংশোধন করতে এবং "আবেগের তাড়নাকে" সংযত করার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতাম।

এহ বাহ্য। প্রশ্নের উত্তর কিংবা আলোচনায় আসা যাক। সৌমিত্রবাবুর প্রথম প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়, তা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ধরা পড়ে নি। 'ইরাক তেলের একচেটিয়া কারবারি' হয়ে দাঁড়াত কি দাঁড়াত না, এ আলোচনা লেখাটির কোথাও করা হয় নি। সুতরাং তাহলে 'তেলহীন দেশগুলির কী উপকার হত?' এ কথাটি কি একেবারেই অবান্তর হয়ে যায় না!

রচনাটিতে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে উপসাগরীয় অঞ্চলের মজুত তেলভাণ্ডারের বেশিটাই যদি ইরাকের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়, তবে তা মার্কিন এবং অন্যান্য পশ্চিমী শক্তিরা কখনই বরদাস্ত করবে না। কারণ, আরব তেলের ভাণ্ডারটির নিয়ন্ত্রণ তাদের কবজাতেই আছে, ভবিষ্যতেও যাতে সে কবজা বিন্দুমাত্র শিথিল না হয়, তার জন্যে যে-কোনো ব্যবস্থা নিতে মার্কিন সহ পশ্চিমী শক্তিগুলোর কিছুমাত্র আটকাবে না। সদ্য-সমাপ্ত উপসাগরীয় যুদ্ধ কি এই ধারণাকেই সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করে না?

দ্বিতীয় প্রশ্নটিও যথেষ্ট স্পষ্ট নয়, তবুও যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। কোন্ রাষ্ট্র কোন্ রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবে না দেবে, সেটা রাষ্ট্রদ্বয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কোনো রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া-না-দেওয়ার দ্বারা রাষ্ট্রসংঘকে মান্য বা অমান্য করার কোনো কথাই ওঠে না। প্রসঙ্গত বলা ভালো, ভারতবর্ষও দীর্ঘদিন ইজরায়েলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় নি। সুতরাং ইজরায়েলের 'রাষ্ট্রসংঘের সনদ রূপায়নে নৈতিক দায়িত্ব' আছে কি না, এ কথাও এখানে একেবারেই খাটে না। সৌমিত্রবাবুর প্রশ্নের ভেতর একটা ভাব লুকিয়ে আছে—জর্ডানের পশ্চিম তীর এবং গাজা-অঞ্চল দখলে রেখে ইজরায়েল খুব একটা অন্যায় কাজ করে নি। তাহলে তো ইরাকের কুয়েত-দখল নিয়েও এমন ভাবনা অনেকে করতে পারেন—এটা আর কী অন্যায়! 'ইজরায়েলের নৈতিক দায়িত্ব' আছে কি নেই, তা নিয়ে আমি ভালোমন্দ কিছু বলতে চাই নি। কথা রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা নিয়ে। যে রাষ্ট্রসংঘ ১৯৬৭-তে ইজরায়েলকে অধিকৃত ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে বলেও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয় নি গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে, সেই রাষ্ট্রসংঘই ইরাকের কুয়েত-দখল প্রসঙ্গে ঝড়ের বেগে সিদ্ধান্ত এবং তাকে রূপায়িত করার জন্যে পৃথিবীর বৃহত্তম সামরিক শক্তিজোটকে সবুজ সংকেত দেখাতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের এই দ্বৈত-চরিত্রকে তুলে ধরাই ছিল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সৌমিত্রবাবুর তৃতীয় প্রশ্নটি বহু-আলোচিত। এখানে সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি করলে চিঠির কলেবর একটি বড়ো প্রবন্ধের আয়তনেও ধরবে না। সুতরাং সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। কেবল দু-একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করলেই যথেষ্ট হবে। হিটলার এবং তার নাজিবাদ যে প্রধানত পৃথিবীর বুক থেকে "ঈশ্বর-বিহীন কমিউনিজমকে" নিশ্চিহ্ন করার জন্যে, তা হিটলারের আত্মজীবনীমূলক রচনা "মাইন কাম্ফ" পড়া থাকলেই জানা যায়। ১৯৩৫-এ জার্মান-ইতালি-জাপানের মধ্যে যে চুক্তির বলে অক্ষশক্তির প্রতিষ্ঠা, তা ছিল কমিনটার্ন্-বিরোধী চুক্তি। ব্রিটেন-ফ্রান্স ও আমেরিকা জার্মানির বিধ্বস্ত শিল্প এবং সমরশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে কী পরিমাণ মদত দিয়েছিল তা ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেরই জানার কথা। আমার বলবার কথা ছিল—হিটলারকে হিটলার বানানোর খেলায় পশ্চিমী শক্তির মদত। ১৯৩৯-এর অনাক্রমণ চুক্তি ( জার্মান-সোভিয়েত ) অনেক পরে। ততদিনে হিটলার তৈরি হয়ে গেছেন। আর এই অনাক্রমণ-চুক্তি যে স্তালিনের সোভিয়েতকে মিত্রশক্তিগুলির দ্বৈতাচারের ফলে করতে হয়, তাও ইতিহাসেরই তথ্য। যৌথ নিরাপত্তার জন্যে উত্থাপিত সোভিয়েত প্রস্তাবকে মিত্রশক্তি বার-বার আলোচনায় ভেস্তে দেয়। পোল্যানডকে রক্ষা করার প্রশ্নে একমাত্র কার্যকর ভূমিকা নিতে পারত সোভিয়েত। কিন্তু পোল্যানড কোনোমতেই সোভিয়েত সেনার সাহায্য নিতে রাজি নয়। ব্রিটেন বা ফ্রান্সও পোল্যানডকে রাজি করানোর জন্যে কোনো চেষ্টা নেয় নি। যৌথ-নিরাপত্তার জন্যে আলোচনার পর আলোচনা চলেছে—৭৫ বার মিটিং হয়েছে। সোভিয়েত প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা বসছেন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর নিম্নপদস্থ অফিসার, যাঁদের হাতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই। এইভাবে ব্রিটেন-ফ্রান্স, সোভিয়েত চেষ্টাকে বানচাল করে দেয়। এ সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেনটে একটি বিতর্কের উল্লেখ করা যায়।

১৯৩৯-এর মার্চে পার্লামেনটে লর্ড প্যাকেনহাম ওয়াল্শ (Pakenham Walsh) জানতে চান যে যৌথ নিরাপত্তা-সংক্রান্ত আলোচনাটি এত দীর্ঘায়িত হচ্ছে কেন? উত্তরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চেমবারলেন বলেন—বিষয়টি জটিল, তাই এত সময় লাগছে। সঙ্গে-সঙ্গেই মন্তব্য জুড়ে দেন—অবশ্য একটা আধা-ইয়োরোপীয়, আধা-এশীয় শক্তির সঙ্গে চুক্তি করে কোনো ভালো কিছু হবে বলে আমি মনে করি না ('I however do not see any good coming out from a treaty with a power half-European and half-Asian.')।

পশ্চিমী শক্তির এই দ্বৈতাচারের ফলই সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। এই চুক্তি লীগ অব নেশনসের বিধির দ্বারা অনুমোদিত। লীগ অব নেশনসের বিধি অনুযায়ী যে-কোনো রাষ্ট্র, যে-কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করতে পারে এবং তা লীগ অব নেশনসে নথিভুক্ত হবে। ১৯৩৯-এর সোভিয়েত-জার্মান চুক্তিও তাই। এই চুক্তির মূলকথা —এক রাষ্ট্র, অন্যকে আক্রমণ করবে না। এবং চুক্তি-কারী কোনো রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে, অন্য রাষ্ট্রটি আক্রমণকারীকে কোনো সাহায্য করবে না।

এই হল ছোটো করে ১৯৩৯-এর সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। এ থেকে অন্তত একটা কথা বোঝা যায়—হিটলারের হিটলার হয়ে ওঠার পেছনে এই চুক্তির কোনো ভূমিকা ছিল না।

এ. ডব্লিউ. মাহমুদ
"হেমছায়া"
আয়রনসাইড রোড
কলকাতা-১৯

৩

## মন ও ক্যানসার

ধন্যবাদ জানাই মার্চ সংখ্যায় জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যবান লেখা ("রোগের চিকিৎসায় শরীর, মন ও তার পরিবেশের আন্তঃসম্পর্কের গুরুত্ব") প্রকাশ করার জন্য।

সিমনটোন পদ্ধতিতে ক্যানসার সম্পর্কে যে জৈব-মানসিক মডেলের কথা বলা হয়েছে, তা অত্যন্ত বাস্তব-সম্মত। কারণ একাধিক গবেষণায় ক্রমশ জানা যাচ্ছে যে, মানুষের দেহ আর মনের সুস্থতা নির্ভর করে দেহস্থ জৈব-রাসায়নিক শৃঙ্খলার উপর। চিকিৎসাপদ্ধতির ধারা অনুসারে কখনও বলা হয়েছে বায়ু-পিত্ত-কফ-এর ভারসাম্য, কখনও সোরা এবং সিফিলিসের সামঞ্জস্য, কখনও-বা অম্ল আর ক্ষারের আনুপাতিক সাম্য। সাধারণ ধারণায় মনে হয়, মূর্ত কিছু কারণে (আবহাওয়া, দুর্ঘটনা, খাদ্য ইত্যাদি) জৈব-রাসায়নিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। কিন্তু ক্রমশ জানা যাচ্ছে যে, মনের উপর সামাজিক পরিবেশজনিত প্রতিক্রিয়ার বিষয়টা সম্পূর্ণ বিমূর্ত থাকে। কেননা, আপাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় এই প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়ার বিষয়টা ধরা পড়ে না। একমাত্র তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, গভীর বিশ্লেষণ এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিষয়টা বোঝা সম্ভব।

লক্ষ করা গেছে যে, ষাটের দশকের পর থেকে বিশ্বব্যাপী কতকগুলো রোগের প্রকোপ বেড়ে গেছে! ক্যানসার ( বিশেষত ব্রেস্ট, সারভিকস, প্রোস্টেট গ্ল্যানড ), দন্তক্ষয়, আলসার, ব্রেনটিউমার, কিডনি, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, রক্তচাপ, শ্বাসযন্ত্র, আর্থরাইটিস ইত্যাদি। লক্ষণীয় হল, এর মধ্যে কোনো রোগই জীবাণুঘটিত নয়, জৈব-রাসায়নিক বিশৃঙ্খলাঘটিত। সিমনটোন সূত্র অনুসারে আমরা যদি রোগের কারণ সামাজিক পরিবেশে অনুসন্ধান করি, তবে দেখতে পাব যে এই সময়ে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে।

প্রথমত, অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুনাফাভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বিজ্ঞানের উন্নত প্রযুক্তিকে এমন-ভাবে কাজে লাগিয়েছে যাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষের অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ফলে, মানুষের শিল্পস্রষ্টা মানসিকতা আহত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যৌননীতির ক্ষেত্রে। মুনাফাভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্ম-কাণ্ডে মানুষের প্রয়োজন না থাকায় জনসংখ্যা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব প্রচার এবং প্রয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে মানুষের জৈবসৃষ্টির মানসিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর্থ-যৌননৈতিক ব্যবস্থার এই পরিবর্তন মানুষের দেহ এবং মনে যে জৈব-রাসায়নিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, তারই পরিণতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানসিক

আর মনঃ-শারীরিক ব্যাধি এবং নানা ধরনের অপরাধ-প্রবণতা। অপরাধমূলক আচরণও যে একধরনের অসুস্থতা, সে কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু বাস্তবে কর্তৃত্ববাদী আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা সব সময় চেষ্টা করে অপরাধ অথবা অসুস্থতার জন্য জিন বা বংশগতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, খাদ্য ইত্যাদি বিষয়গুলিকে প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে। এর ফলে একাধিক সুবিধা হয়। প্রথমত, কর্তৃত্ববাদী আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থাগত ত্রুটি গোপন করা যায়। দ্বিতীয়ত, ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা বজায় রেখে কায়েমি স্বার্থ রক্ষা করা যায়। তৃতীয়ত, কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাগত ত্রুটির দায় ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়।

পরিশেষে জানাই, মানুষের সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন মনে করে সমস্যা সমাধানের জন্য বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা আর আন্দোলন প্রকৃত অর্থে মানুষকে সমস্যামুক্ত করতে সক্ষম হবে না। মানুষের দেহ-মনের সাথে প্রকৃতি এবং সমাজের ( অর্থনীতি আর যৌননীতি ) আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনা করে এক সামগ্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় প্রকাশিত জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের রচনাটি আগামী আন্দোলনের রূপরেখা নির্মাণে সহায়ক হবে বলে মনে করি।

**বৈশালী সিনহা**
কল্যাণী, নদীয়া

৪

## প্রসঙ্গ "অবৈধ"

মীনাক্ষী ঘোষের "অবৈধ" গল্পটি পড়ে মনের ভেতর এক শিহরন অনুভব করলাম। সমস্ত স্নায়ু টান-টান হয়ে রইল বহুক্ষণ। তারপর এক বিষণ্ণ অথচ মধুর গানের রেশ রইল মনপ্রাণ জুড়ে, তার ওমটা উপভোগ করলাম আরও খানিকক্ষণ। "অবৈধ" কথাটির এত সুদূরপ্রসারী অর্থ, এত সুন্দর তার ব্যাপ্তি আমি আগে পাই নি। গল্পটির মধ্যে আলাদা-আলাদা সময়ে ও ঘটনায় "অবৈধ" কথাটি এসেছে বারে-বারে, প্রতিবারই কথাটির অর্থ মনকে গভীরভাবে নাড়া দিচ্ছে। মোহনার প্রতি এক সহানুভূতিতে মন ভরে উঠছে। মনে হচ্ছে, সত্যি কি কবির এই সঙ্গসুখ বা ব্রতর সামান্য সময়ের সান্নিধ্য অথবা মনের জোয়ারে লেখায় ভেসে থাকার তাগিদের সুখটুকু কি "অবৈধ" ? আমার ধারণা, ঘরে-ঘরে অনেক মেয়েই আছে যাদের জাগতিক অর্থে সব পাওয়ার পরও কিছু শূন্যতা থাকেই। হয়তো তাদের রূপ, রুচি ও আগ্রহ আলাদা, কিন্তু মোদ্দা কথার সুরটি এক। লেখিকা হয়তো বেশ কিছু মেয়ের সঙ্গে মিশে ও মনের দরজায়-দরজায় কড়া নেড়ে, তাদের না-বলা কথাগুলিকে জুড়ে একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আধুনিক সমাজকে। এই না-বলা কথাগুলি লেখিকার স্বচ্ছন্দ কলমের ডগায় এসে, তাঁর শিল্পী-মনের কল্পনার ছোঁয়া পেয়ে একটি সুন্দর ছবি হয়ে উঠেছে। লেখিকাকে মন উজাড় করে অভিনন্দন জানাই। আরও কিছু এমন বলিষ্ঠ মননশীল লেখা পাবার অপেক্ষায় থাকব।

**জয়শ্রী মুখার্জী**
১৪ সি রোড ইস্ট
নর্দান টাউন
জামসেদপুর-৮৩১০০১

একটি লেখা সম্বন্ধে ভালোলাগার কথা জানাতে এই পত্র। লেখাটি মীনাক্ষী ঘোষের গল্প "অবৈধ", ( এপ্রিল, চতুরঙ্গ )।

এই লেখিকার গল্প আগে পড়ি নি। লেখিকা এই গল্পে সাহিত্যরসপুষ্ট ভাষায় বর্ণনায় উপমায় বক্তব্য বিষয়টি সুন্দরভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।





তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

তা ছাড়া, গল্পের নামকরণটি যেমন আকর্ষণীয় হয়েছে তেমনি যথোপযুক্ত। "অবৈধ" শব্দটির অভিধানিক অর্থ পালটে ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। এক কথায় বলা যায়, 'শাবাশ'।

**প্রতিমা মুখোপাধ্যায়**
এফ-২২, সি. আই. টি. বিল্ডিং
ক্রিস্টোফার রোড, কলিকাতা-১৪

৫

## কিছু তথ্য সম্বন্ধে সংশয়

'চতুরঙ্গ' উচ্চমানের পত্রিকা। এ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি অতীব মূল্যবান এবং তথ্যসমৃদ্ধ। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের কোনো কোনো বক্তব্য সম্বন্ধে আমার সংশয় জেগেছে। তাই এই পত্রের অবতারণা।

প্রখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ মিত্র "ধর্মে, সমাজে, ভাষায় প্রগতিবাদী বিবেকানন্দ" প্রবন্ধে ( জানুয়ারি, ৯১ ) লিখেছেন, ১৮৭৮-এর ১৫ মে 'কেশবচন্দ্রের সাধারণ সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সে দলের সদস্য এবং কেশবচন্দ্রের "নববৃন্দাবন নাটকে" তিনি যোগীর ভূমিকায় অভিনয়ও করেন ( পৃ ৬৯৪ )।' উল্লেখ্য এই যে, ১৮৭৮ সনে কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ১৮৭৮ সনে কুচবিহারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বিজয়কুমার গোস্বামীর নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মরা কেশবচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এর ফলে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" দ্বিখণ্ডিত হয়। শিবনাথ ও বিজয়কৃষ্ণের নেতৃত্বে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমর্থন ও সহযোগিতায় ১৮৭৮ সনে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্র কিছুদিন পরে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে "নব বিধান" প্রতিষ্ঠিত করেন। নরেন্দ্রনাথ, শিবনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ পরিচালিত "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে"র সভ্য ছিলেন—কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত "নব বিধানে"র সদস্য ছিলেন না। তবে আমন্ত্রিত হয়ে নরেন্দ্রনাথ "নববিধানে"র "নববৃন্দাবন" নাটকে যোগদান করেছিলেন। হরপ্রসাদবাবু অন্যত্র লিখেছেন, '১৮৭৯ সালে *Theistic Quarterly Review* পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরেজি প্রবন্ধ 'Paramahamsa Ramakrishna' বেরোয় এবং পরে পৃথক পুস্তিকা রূপে "উদ্বোধন" থেকে সেটি ছাপা হয় ( পৃ ৭০১ )।' হরপ্রসাদবাবুর বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক নয়। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধ *The Hindu Saint* শিরোনামে **The Theistic Quarterly** পত্রিকার ১৮৭৯ সনের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় বের হয়। উক্ত প্রবন্ধটি ১৮৭৬ সনের ১৬ই এপ্রিল *Sunday Mirror* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবন্ধটি ১৯০৭ সনে উদ্বোধন অফিস হতে **Paramahamsa Ramakrishna** নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উদ্বোধন হতে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হবার বহু বছর পূর্বেই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৩ সনে আমেরিকা যাবার সময় স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত পুস্তিকার কিছু কপি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৯৪ সনের ২৩শে জুন স্বামীজী তাঁর এক মাদ্রাজি শিষ্যকে লেখেন, 'ভাল কথা, তুমি মজুমদারের লেখা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত্র খানকতক পাঠাতে পার? কলকাতায় অনেক আছে' (পত্রাবলী, ১ম ভাগ, শ্রাবণ, ১৩৭১, পৃ ১৯৪ )।'

অরুণা হালদার "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" ( ফেব্রুয়ারি, ৯১) প্রবন্ধে লিখেছেন, 'স্ত্রীলোক দলের পক্ষে অপরিহার্য—পুরুষেরই মতো তাকে সংগ্রহ করে জয় করে এনে বেঁধে রেখে বহু আয়াসে পোষ মানানোর

দরকার হত। বর্তমানের শাঁখা, সিন্দুর, আংটি-লৌহ-বলয় বা অপরাপর যা কিছু ধারণ করা বিবাহের মাঙ্গলিক প্রতীক বলে চিহ্নিত, তার সবই অতীতের ভুলে-যাওয়া প্রতীকীভবনের ইতিহাস। অলঙ্কারগুলি কোথাওউৎকোচ পরের দিকে, প্রথম দিকে ডাণ্ডাবেড়ি (পৃ ৭৬৭)।' দীর্ঘদিন অনুসন্ধান করেও প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বা অন্য কোনো দেশের আদিম সমাজে লেখিকার উক্তির সমর্থন খুঁজে পাই নি। আশা করি তিনি এ সম্পর্কে আলোকপাত করে আমাদের সংশয়ের নিরসন করবেন।

পুরুষের বহুস্ত্রী গ্রহণ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'মহাভারতের কৃষ্ণের ষোলো হাজার পত্নী ছিলেন। তাঁর প্রাক্ পর্বে সহস্র গোপিনী তাঁকে ভজনা করত (পৃ ৭৭৫)।' মূল মহাভারতে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। ব্রজলীলা মূল মহাভারতে স্বীকৃতি লাভ করে নি। রাধাকেও মূল মহাভারতে খুঁজে পাওয়া যায় না। রাধাকে প্রথম পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে। কোনো অর্বাচীন মহাভারতে ব্রজলীলা এবং শ্রীকৃষ্ণের ষোলো হাজার পত্নীর উল্লেখ থাকা অসম্ভব নয়।

**কালিদাস মুখোপাধ্যায়**
৪১, শ্রীরামপুর রোড (নর্থ)
গড়িয়া, কলিকাতা-৭০০০৮৪

৬

## আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিঠি

রউফ সাহেব, অনেক দিন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ নেই, আশা করি ভালো আছেন। প্রতিমাসে চতুরঙ্গ আসে, আমার প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কথা নতুন করে মনে পড়ে। আপনার কাছে সত্যি অপরাধী হয়ে আছি। এখন পর্যন্ত আপনাকে একটা লেখা দিতে পারলাম না। এখন আশা করছি মাস দুয়েকের মধ্যে আপনাকে একটা গল্প পাঠাতে পারব। চতুরঙ্গ পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় নুরুল হুদা সাহেবের "অমর শিল্পী বুলবুল" পড়ে খুশি হয়েছি। কামাল সাহেব বুলবুল চৌধুরী সম্বন্ধে পশ্চিম বাঙলার মানুষের যে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা নিয়ে আক্ষেপ করেছেন, আমাদের এখানেও তা কোনো অংশে কম নয়। শিল্পসংস্কৃতির চর্চা করে এমন লোকদের মধ্যে বুলবুল চৌধুরী সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা আছে, তাদের সংখ্যা খুবই কম। তাঁর উপর লেখা নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের বইটি খুবই তথ্যসমৃদ্ধ। কামাল সাহেব ওই বইটি পড়লে ভালো হয়। তবে হুদা সাহেবের বইতে বুলবুলের জীবনের এমন একটি অংশের বিবরণ পাই যা অন্য কোথাও নেই।

মার্চ সংখ্যায় এ. ডব্লিউ. মাহ্‌মুদের লেখাটি মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের পটভূমি জানবার জন্যে বিশেষ সহায়ক। মাহমুদ সাহেব কিছুদিন ঢাকা ইউনিভার-সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন, ১৯৭৫ কি ৭৬ সালে। তখন আমি "ইলিয়াড" ও "ওডিসি" খুব পড়তাম। তো, তাঁর এক ছাত্রের পরামর্শে প্রাচীন গ্রীক সমাজ এবং ধর্ম সম্বন্ধে জানতে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। এত চমৎকার করে বলেছিলেন যে চার-চারটি ঘণ্টা কোন্ দিক দিয়ে যে কেটে গিয়েছিল বুঝতেই পারি নি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। ওই দিনের পর আর ছাখাও হয় নি, কিন্তু তাঁর আলোচনার সূত্র ধরে পরে এই বিষয়ে যাই পড়ি, তাঁর কথা বিশেষ করে মনে হয়। আপনি যদি তাঁকে দিয়ে পুরনো গ্রীক সমাজের উপর লেখাতে পারেন তো আমরা উপকৃত হই।

এই সংখ্যায় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের "ঘুঘু ডাকে" পড়ে আমি একেবারে অভিভূত। তাঁর সঙ্গে চিঠি-পত্রে পরিচয় হয়েছে, "কোরক" পত্রিকার একটি সংখ্যায় নিজের লেখা সম্বন্ধে তাঁর একটি লেখাও খুব ভালো লেগেছিল। তাঁর "পক্ষ-বিপক্ষ" উপন্যাসটি



পড়েছেন নিশ্চয়ই। অভিজিৎ সেনের "অন্ধকারের নদী" আর এই উপন্যাসটি পড়ে সাম্প্রতিক পশ্চিম-বাঙলাকে ভালোভাবে স্পর্শ করতে পারি। "ঘুঘু ডাকে" গল্পে শ্রীপতি পাকড়াশি অবক্ষয়ের প্রতীক নয়—নিজেই ক্ষয় আর ধ্বংসের পারসোনিফিকেশন। শেষ বাক্যে তার এস্তেকাল হল; এস্তেকাল শব্দে যে আভিজাত্য, ইজ্জত আর সম্ভ্রম রয়েছে এখানে তার বিপরীত ব্যবহারে এইসব আব্রুকে একেবারে ন্যাংটো করে দেওয়া হয়েছে। তবে আমরা কি এখন আশা করতে পারি যে শ্রীপাকড়াশি মহাশয়ের তিরোভাবের সঙ্গে এমন কিছুর আবির্ভাব ঘটবে যা তার প্রাপ্য মেটাতে না পারলেও জীবনযাপন একটু-খানি সহনীয় করে তুলতে পারে? এই গল্পে মিথের ব্যবহার সম্পূর্ণ সফল। ঠিক ব্যবহার করা হয় নি, বরং গল্পের অংশ হয়ে উঠেছে। কোথাও আরোপিত মনে হয় না। ভাঙাচোরা, বাসি আর তেতো পরিবেশে ঘুঘু নিয়ে অনন্তকাল থেকে প্রচলিত গল্পটি এমন চমৎকার প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে, গল্পের রক্তে তা রক্তের আরশি হয়ে মিলে গিয়েছে যে লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা দেখে খুশিতে মনটা ভরে ওঠে। গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রচলিত গাথা-মিথ বলেন, কেচ্ছা বলেন—আমাকে বরাবরই আকৃষ্ট করে। আমার উপন্যাস "চিলেকোঠার সেপাই"-তে যমুনা নদীর ভেতর হাজার ঘোড়ার হ্রেষার একটা ব্যাপার আছে, এই গল্পটা আমাদের দেশে যমুনা নদীর পশ্চিমের গ্রামগুলিতে আমি শুনেছি। ঢাকা শহরের পুরনো এলাকায় ভিকটোরিয়া পার্কের আশেপাশে সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকে একজন গলাকাটা জ্বিন সবাইকে রাতভর ভয় দেখিয়ে আসছে। আগে সে ছিল বিদ্রোহী সেপাই, বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে সায়েবরা তাকে ফাঁসিতে ঝোলায়। তো, এই গল্পটি আমার উপন্যাসে আমি নিয়ে আসতে চেষ্টা করছি। এখন এসব দেখে কেউ-কেউ ল্যাটিন অ্যামেরিকার সাম্প্রতিক প্রবণতার প্রভাব আবিষ্কার করেন। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পেও তা লক্ষ করতে পারেন। কিন্তু এসব তো আমাদের দেশেই প্রচলিত, ল্যাটিন অ্যামেরিকার গল্প পড়েও যদি আমি অনুপ্রাণিত হই, তাতেই বা কী এসে যায়? সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পটি শতকরা একশো ভাগ তাঁরই গল্প, একশো ভাগ বাঙলা গল্প।

**আখতারুজ্জামান ইলিয়াস**
১২/৩ কে. এম. দাশ লেন
টিকাটুলি, ঢাকা-১২০৩

৭

## খ্যাতিমান সাহিত্যসমালোচকের পত্র

সাম্প্রদায়িকতার সর্বনাশ আষ্টেপৃষ্ঠে যখন আমাদের জড়িয়ে ধরেছে, তখন কিছু মুক্তবুদ্ধি রচনা আপনার পত্রিকায় পড়তে পারছি। এইটি আপনারা খুব বড়ো কাজ করছেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল এমন কাজ করা আর না-করার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

এপ্রিল সংখ্যায় এক নতুন লেখিকা মীনাক্ষী ঘোষের একটি চমৎকার গল্প পড়লাম। লেখিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পথে যাবার যন্ত্রণা আর নারী হিসেবে আত্মপ্রকাশের পথে বাধার মর্মান্তিকতা তিনি আশ্চর্য সংবেদনশীলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভবিষ্যতে এই মহিলার গল্প পড়ার জন্য আমি উৎসুক হয়ে থাকব। উনি আরো লিখুন।

**অশ্রুকুমার শিকদার**
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

৮

## প্রসঙ্গ উইলিয়াম জোন্‌স্

এপ্রিল ১৯৯১ "চতুরঙ্গে" অধ্যাপক আবু তাহের মজুমদারের "স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ ও অন্যান্য

প্রবন্ধ" গ্রন্থের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচক শ্রদ্ধেয় আজহারউদ্দীন খান ভারতে জোন্‌সের আবির্ভাব এবং তার তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং বাঙলা ভাষায় আবু তাহের মজুমদারের প্রবন্ধগুলির সার্থকতা ব্যাখ্যা করেছেন। এই সমালোচনার বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে; সেগুলি বিনীতভাবে নিবেদন করি :

ইংরাজি ভাষায় তো বিদেশী পণ্ডিতেরা জোন্‌স্ সম্পর্কে গ্রন্থ ও বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেনই; অন্তত দুজন ভারতীয় ইংরাজিতে জোন্‌স্ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন : (ক) এস. এন. মুখার্জী, "স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ : এ স্টাডি ইন এইটিন্‌থ সেনচুরি ব্রিটিশ অ্যাটিচুডস টু ইণ্ডিয়া", ওরিয়েন্ট লংম্যান; প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৮, ২য় সংস্করণ ১৯৮৭। (খ) জনার্দন প্রসাদ সিংহ, "স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্—হিজ মাইনড অ্যানড আর্ট", এস. চাঁদ অ্যানড কোম্পানি, নয়া দিল্লী, ১৯৮২।

বাঙলা ভাষাতেও জোন্‌স্ সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধের যে-তালিকা জনাব আজহারউদ্দীন খান দিয়েছেন, তার সঙ্গে আরও দু-একটি যোগ করতে চাই : "মাসিক মোহাম্মদী"তে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ সংখ্যা) অধ্যাপক এ. বি. মোহাম্মদ সুলতানুল আলম চৌধুরী জোন্‌সের উপর একটি স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে জোন্‌সের মূল কর্ম-ধারার সুন্দর তথ্যচিত্র তুলে ধরেন। সে সময় তাঁর তত্ত্বাবধানে সোসাইটিতে রক্ষিত বহু আরবি, ফারসি, উর্দু পাণ্ডুলিপির তালিকা নির্মাণের (ক্যাটালগ) কার্য পরিচালিত হয়েছিল।

"পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ"-এ (১৯৮৩) আমার প্রবন্ধ "স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্-এর ভারত আগমনের দুশো বছর" প্রকাশিত হয়েছিল।

"রৌরব"-এ (কলকাতা বইমেলা সংখ্যা, ১৯৮৪) এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দুশো বছর উপলক্ষে আমার প্রবন্ধ "তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ" প্রকাশিত হয়েছিল।

"দূরবীক্ষণ"-এ (জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯০) অধ্যাপক আবু তাহের মজুমদার-লিখিত "প্রাচ্যসাহিত্য-সমালোচক জোন্‌স" প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব আজহারউদ্দীন লিখিত সমালোচনায় প্রবন্ধটির উল্লেখ আছে—কিন্তু কোথায় সেটি প্রকাশিত হয়েছিল তার উল্লেখ নেই।

মহাকবি গ্যেটে "শকুন্তলা"র যে-অনুবাদ পাঠ করে তাঁর বিখ্যাত উক্তি—অর্থাৎ ঐ গীতি-কবিতাটি লিখেছিলেন, জার্মান ভাষায় সেই অনুবাদ হার্ডার করেন নি, করেছিলেন গেঅর্গ ফর্স্টার ১৭৯১)।

যাই হোক, সমালোচকের সঙ্গে আমি একমত যে আবু তাহের সাহেবের গ্রন্থখানি শুধুমাত্র জোন্‌স্ সম্পর্কিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল।

**আবুল হাসনাত**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ